কয়লা

রামচন্দ্র ভট্টাচার্য

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

কয়লা

শ্রীরামচন্দ্র ভট্টাচার্য

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ
[বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সৌজন্যে]

KOILA
by Sri Ramchandra Bhattacharjya

প্রথম পর্ষদসংস্করণ
প্রকাশকাল : জুলাই, ১৯৭৯

প্রকাশক :
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ
আর্য ম্যানসন (নবম তল)
৬এ, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার
কলিকাতা-৭০০০১৩

মুদ্রক :
শ্রীসুকুমার ঘোষ
পাইওনিয়ার প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
৪৭/এফ্, শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট্
কলিকাতা—৭০০০০৪

প্রচ্ছদ : বিমল দাস

দাম : দুই টাকা মাত্র

Published by Prof. Pradyumna Mitra, Chief Executive officer, West Bengal State Book Board under the Centrally Sponsored Scheme of Production of books and literature in regional language at the University level, launched by the Government of India, the Ministry of Education and Social Welfare (Depaptment of Culture) New Delhi.

পর্ষদ সংস্করণের ভূমিকা

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রকাশিত এবং অধুনা দুষ্প্রাপ্য লোকরঞ্জন বিজ্ঞান-পুস্তিকামালার অন্তর্গত সুখপাঠ্য নিবন্ধিকাগুলি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ পুনর্মুদ্রণে অগ্রণী হয়েছেন। জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় যেসব দুস্প্রাপ্য অথচ ছাত্র ও শিক্ষার্থীর উপযোগী পুস্তকাদি রয়েছে সেগুলির পুনর্মুদ্রণ-প্রকল্পের অন্তর্গত এই কার্যসূচী। বিজ্ঞান পরিষদ পুস্তিকামালার জনপ্রিয়তা ও দুষ্প্রাপ্যতা এ জাতীয় পুস্তিকাগুলির পুনর্মুদ্রণ সম্পর্কে আমাকে উৎসাহিত করে। ফলে পরিষদ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে ও পর্ষদ পরিচালক মণ্ডলীর অনুমোদন সংগ্রহ করে আমি এ কাজে ব্রতী হই। পরিষদ কর্তৃপক্ষ প্রকাশনা অনুমতিদানে আমার প্রয়াসকে সার্থকতা দিয়েছেন। তাঁদের কাছে আমি পশ্চিমবঙ্গের সকল পড়ুয়া শিক্ষার্থীর পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে রাখি। এখন আমাদের এই মুদ্রণপ্রয়াস যদি পাঠক-সমাজের আনুকূল্যলাভে সমর্থ হয়, তবেই এ জাতীয় ভবিষ্যত কর্মদ্যোগে পর্ষদ কর্তৃপক্ষ উৎসাহ বোধ করবেন। আশা রাখি সুধী পাঠক ও শিক্ষার্থী উভয়েই এই গ্রন্থমালার পুনঃ প্রকাশনা উদ্যমকে স্বাগত জানাবেন।

কলিকাতা
জুলাই, ১৯৭৯

প্রদ্যুম্ন মিত্র
মুখ্য প্রশাসন আধিকারিক

KOILA
by Sri Ramchandra Bhattacharjya

প্রথম পর্যদসংস্করণ
প্রকাশকাল ঃ জুলাই, ১৯৭৯

প্রকাশক ঃ
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ
আর্য ম্যানসন (নবম তল)
৬এ, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার
কলিকাতা-৭০০০১৩

মুদ্রক ঃ
শ্রীসুকুমার ঘোষ
পাইওনিয়ার প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
৪৭/এফ, শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট
কলিকাতা—৭০০০০৪

প্রচ্ছদ ঃ বিমল দাস

দাম ঃ দুই টাকা মাত্র

Published by Prof. Pradyumna Mitra, Chief Executive officer, West Bengal State Book Board under the Centrally Sponsored Scheme of Production of books and literature in regional language at the University level, launched by the Government of India, the Ministry of Education and Social Welfare (Depaptment of Culture) New Delhi.

পর্ষদ সংস্করণের ভূমিকা

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রকাশিত এবং অধুনা দুষ্প্রাপ্য লোকরঞ্জন বিজ্ঞান-পুস্তিকামালার অন্তর্গত সুখপাঠ্য নিবন্ধিকাগুলি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ পুনর্মুদ্রণে অগ্রণী হয়েছেন। জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় যেসব দুষ্প্রাপ্য অথচ ছাত্র ও শিক্ষার্থীর উপযোগী পুস্তকাদি রয়েছে সেগুলির পুনর্মুদ্রণ-প্রকল্পের অন্তর্গত এই কার্যসূচী। বিজ্ঞান পরিষদ পুস্তিকামালার জনপ্রিয়তা ও দুষ্প্রাপ্যতা এ জাতীয় পুস্তিকাগুলির পুনর্মুদ্রণ সম্পর্কে আমাকে উৎসাহিত করে। ফলে পরিষদ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে ও পর্ষদ পরিচালক মণ্ডলীর অনুমোদন সংগ্রহ করে আমি এ কাজে ব্রতী হই। পরিষদ কর্তৃপক্ষ প্রকাশনা অনুমতিদানে আমার প্রয়াসকে সার্থকতা দিয়েছেন। তাঁদের কাছে আমি পশ্চিমবঙ্গের সকল পড়ুয়া শিক্ষার্থীর পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে রাখি। এখন আমাদের এই মুদ্রণপ্রয়াস যদি পাঠক-সমাজের আনুকূল্যলাভে সমর্থ হয়, তবেই এ জাতীয় ভবিষ্যত কর্মদ্যোগে পর্ষদ কর্তৃপক্ষ উৎসাহ বোধ করবেন। আশা রাখি সুধী পাঠক ও শিক্ষার্থী উভয়েই এই গ্রন্থমালার পুনঃ প্রকাশনা উদ্যমকে স্বাগত জানাবেন।

কলিকাতা
জুলাই, ১৯৭৯

প্রদ্যুম্ন মিত্র
মুখ্য প্রশাসন আধিকারিক

উৎসর্গ পত্র

ন্যাশন্যাল প্রোফেসার সত্যেন্দ্রনাথ বোসের মতে "যাঁরা বলেন বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান লেখা যায় না, তাঁরা হয় বিজ্ঞান জানেন না, নয় বাংলা জানেন না বা উভয় বিষয়েই অনভিজ্ঞ।" প্রোফেসার বসুর মতটিকে অকাট্য মনে করে ত্রিশ বছর ধরে যে বিজ্ঞানের চর্চা করেছি, তা আমার মাতৃভাষা বাংলায় লিখতে সাহস করেছি। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ আমার লিখিত "কয়লা" পুস্তিকাখানি প্রকাশ করবার ভার নিয়ে আমার বিজ্ঞানলব্ধ জ্ঞানকে বাংলার নর-নারীর কাছে পৌছে দেবার পথ সুগম করে দিয়েছেন। অগ্রজপ্রতিম 'সত্যেন দা' আজ চল্লিশ বছর ধরে আমাকে বিজ্ঞান সাধনায় অনুপ্রাণিত করে আসছেন। তাঁর এই অকৃত্রিম স্নেহের প্রতিদানে কিছুই দিতে পারিনি। তাই এই পুস্তিকাখানি তাঁর নামে উৎসর্গ করে তাঁর প্রতি আমার অচল শ্রদ্ধা ও ভালবাসার কিঞ্চিৎ প্রমাণ দিচ্ছি। ইতি—

দিল্লী
১লা বৈশাখ, ১৩৭২

রামচন্দ্র ভট্টাচার্য

ভূমিকা

আমাদের ভারতমাতা যে রত্নপ্রসূ, তা কারও অবিদিত নয়। রত্ন বলতে আমরা হীরা, চুনি, পান্না মরকত, বৈদূর্য ও মুক্তা প্রভৃতিকেই বুঝি। আমাদের গোলকুণ্ডার হীরার খনি এবং কোহিনুরের কথা কে না জানে! কিন্তু এই খনিজ বা শুক্তিজ রত্ন ছাড়াও ইতিহাসে আমরা আর এক প্রকার রত্নের সন্ধান পাই। যে সব ঋষিরা আমাদের বেদ, উপনিষদ, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক লিখে গেছেন, যাঁরা রামায়ণ ও মহাভারত প্রভৃতি মহাকাব্য রচনা করে গেছেন, যাঁরা ষড়দর্শনের দ্বারা সত্যের আলোর সন্ধান দিয়ে গেছেন—এক কথায় যাঁরা ভারতের কৃষ্টি গড়ে তুলেছেন, তাঁদেরও রত্ন আখ্যা দেওয়া হয়েছে। তাই রাজা বিক্রমাদিত্যের সভায় হীরা, মুক্তা, চুনী, পান্না, মরকতের ছড়াছড়ির সঙ্গে কালিদাস, ভবভূতি প্রমুখ নবরত্নের সন্ধান পাই। হীরা, চুনী, পান্না প্রভৃতি খনিজগুলি যেমন তাদের দীপ্তির প্রখরতা, বর্ণচ্ছটা এবং সৌন্দর্য ও স্বচ্ছতার জন্যে রত্ন আখ্যা পেয়েছে, ঐ সব ঋষি দার্শনিক ও কবিরাও তেমনি তাঁদের প্রখর ধীশক্তির প্রাচুর্যে সত্যের সন্ধান দিয়ে, সুন্দরের স্বরূপ দেখিয়ে, বাস্তবের কঠোরতাকে স্বপ্নরাজ্যের রূপকাঠির পরশ দিয়ে আমাদের জীবনকে সরস করে রত্ন আখ্যা পেয়েছেন। এই সব মহামানবদের কথা এখানে আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। আমরা শুধু খনিজ রত্নের কথাই এখানে আলোচনা করবো।

প্রথম মহাযুদ্ধ থেকে আরম্ভ করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসান কাল অবধি সারা বিশ্বে একটা নতুন যুগের সূচনা হয়েছে। যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রাজা-মহারাজাদের যুগ চলে গেছে। রাজনীতির ক্ষেত্রে ভারতের আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। পরাধীন ভারত আজ স্বাধীন হয়েছে, আর স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের রাজা-মহারাজাদের রাজ্যগুলি নিজস্ব সত্তা হারিয়ে ভারতের অঙ্গীভূত হয়েছে। ভারত বলতে আজ আমরা অখণ্ড ভারতীয় সত্তার কথাই বুঝি।

কিন্তু এমন দিন ছিল, যখন ভারতের বিভিন্ন রাজা-মহারাজা ও তাঁদের রাজ্যগুলির ইতিহাসই ছিল ভারতের ইতিহাস। সে যুগে রাজা-মহারাজাদের

জীবনে হীরা, চুনী, পান্না প্রভৃতি খনিজ রত্নগুলির প্রভাব দেখা যায়। দুর্দিনে এই মহামূল্য রত্নগুলি তাঁদের আর্থিক সমস্যার সমাধান করে দিত। তাই এই রত্নগুলি ছিল তাঁদের মহাসম্পদ। তখনকার দিনে ঐ রত্নগুলি তাঁদের বেশ-ভূষার শোভাবর্ধন করতো বা রাণী-মহারাণীর আভরণ রূপে ব্যবহৃত হতো, জনসাধারণের কোন কাজেই তারা আসতো না। কিন্তু এই জনজাগরণের যুগে ভারতের জাতীয় জীবনে এই দুষ্প্রাপ্য রত্নগুলির মূল্য সীমিত। জনগণের কল্যাণ সাধনের জন্যে এমন রত্নের সন্ধান করতে হবে, যা এই দরিদ্র দেশের জনগণকে দারিদ্র্যের পীড়ন থেকে মুক্তি দিতে পারে। অনেকে হয়তো এমন রত্নের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হতে পারেন, কিন্তু নিরাশ হওয়ার কারণ নেই। আগেই বলেছি, মা আমাদের রত্নপ্রসূ। মায়ের বুকে যে কালোমাণিক আছে, তার কথা ভুলবেন না। আমাদের এই কালোমাণিক হচ্ছে হীরার নিকট আত্মীয় কয়লা।

কবির সঙ্গে সুর মিলিয়ে আমরাও গাইতে পারি—

কালো, তাতে কিবা এল গেল
আঁধার যখন আসবে নেমে—
তখন এই কালো মেয়ে করবে জগৎ আলো।

সূচীপত্র

কয়লা

কয়লার জন্মকথা

কয়লাকে যদিও খনি থেকেই বের করা হয়, তবুও তাকে ঠিক খনিজ বলা চলে না। কথাটা একটু অসঙ্গত মনে হবে জানি, কিন্তু এই আপাত অসঙ্গত কথাটার মধ্যে অনেকখানি সত্য নিহিত আছে। খনিজ বলতে আমরা অজৈব পদার্থ, যেমন—সোনা, রূপা, লোহা, তামা, সীসা প্রভৃতি ধাতুমিশ্রিত পদার্থ-গুলিকেই বুঝি। এই সব অজৈব খনিজ পদার্থগুলি পৃথিবীর জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই ধরিত্রীর গর্ভে স্থান পেয়েছে। কয়লা বা পেট্রোল খনি থেকে উদ্ভূত এবং ভূগর্ভে নিহিত থাকলেও সেগুলি এই ধরনের খনিজ নয়। এরা জৈব পদার্থ থেকে উদ্ভূত, তাই এদের ঠিক খনিজ পদার্থ বলা চলে না। দধীচির অস্থির মত কয়লা কতকগুলি উদ্ভিদের প্রস্তরীভূত অস্থি, একথা বললে হয়তো অতিরঞ্জন হবে না। দধীচির অস্থি দেবতাদের উপকারে লেগেছিল, আর কয়লা মানুষের উপকারে লেগেছে ও লাগবে। কথাগুলি একটু আজগুবি মনে হতে পারে। তাই কয়লার জন্মকথাটা খুলে বলা দরকার। কিন্তু কয়লার জন্মকথা বলতে গেলে তার আগে কতকগুলি সাধারণ কথা বলতে হয়। এই কথাগুলি না বললে কয়লার জন্মকথাটা ঠিক বোঝানো যাবে না এবং কয়লা যে খনিজ পদার্থ নয়, তাও প্রতিপন্ন করা যাবে না। তাই কয়লা ছেড়ে ধরিত্রীর কথা এখানে একটু বলা দরকার।

ধরিত্রীর জন্ম থেকে আরম্ভ করে এর জীবনের ইতিহাস নিয়ে বহু কথাই বলতে পারা যায় এবং সে সব কথাগুলি জানাও আমাদের বিশেষ দরকার। কিন্তু ধরিত্রীর কথা আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়, তাই কয়লার জন্মকথা জানবার জন্যে যতটুকু দরকার শুধু সেটুকুই বলবো।

জগৎ পরিবর্তনশীল। তাই আমাদের ধরিত্রীকেও (পৃথিবী) নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। বৈজ্ঞানিকেরা হিসাব করে দেখেছেন

যে, আমাদের এই পৃথিবীর বয়স মাত্র তিন থেকে সাড়ে তিন বিলিয়ন বছর মাত্র! আমাদের শৈশব, বাল্য, যৌবন, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধাবস্থাগুলি যেমন আমাদের বয়স সম্বন্ধে ইঙ্গিত দিতে পারে, ভূতত্ত্ববিদ্‌দের নির্দেশিত যুগগুলিও তেমনি পৃথিবীর বয়সের ইঙ্গিত দিতে পারে। যুগ বলতে অনেকে হয়তো সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি প্রভৃতি কালগুলিকেই মনে করবেন। কিন্তু ভূতত্ত্ববিদ্‌দের যুগ-গুলি ঠিক এই ধরনের নয়। সত্য, ত্রেতা, কলি প্রভৃতি যুগগুলি যেমন মানুষের সামাজিক জীবনের বৈশিষ্ট্যের ইঙ্গিত দেয়, তেমনই ভূতত্ত্ববিদ্‌দের যুগগুলিও ধরিত্রীর জীবনযাত্রার বৈশিষ্ট্যের ইঙ্গিত দিয়ে থাকে। তাই এই দুই প্রকার যুগের মধ্যে অনেক প্রভেদ আছে। প্রথম ধরনের যুগগুলি কালের উপর প্রতিষ্ঠিত। এর কাল গতিশীল তাই তাদের আমরা ধরতে-ছুঁতে পারি না। ভূতত্ত্ববিদ্‌দের যুগগুলি ধরিত্রীর বুকের উপর যে সব স্তর জমা রেখে যায়, তাদের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাই তাদের আমরা ধরতে, ছুঁতে ও দেখতে পাই। ধরিত্রীর শৈশবের যুগগুলিকে ভূতত্ত্ববিদেরা প্যালোজোয়িক, বাল্যের যুগগুলিকে মেসোজোয়িক ও যৌবনের যুগগুলিকে অ্যাজোয়িক নামে অভিহিত করেছেন। ক্যাম্বিয়ান, সিলুরিয়ান, ডিভোনিয়ান, কার্বন ও পারমিয়ান যুগগুলি প্যালোজোয়িকের অন্তর্গত। এদের মধ্যে কার্বন ও পারমিয়ান যুগের উদ্ভিদ-সমূহই কয়লার জন্মদাতা বলা যেতে পারে। ইউরোপে কার্বন যুগের উদ্ভিদ এবং ভারতে পারমিয়ান যুগের উদ্ভিদই যে কয়লায় রূপান্তরিত হয়েছে, বৈজ্ঞানিকেরা তার প্রমাণ পেয়েছেন। তাঁরা বলেন যে, প্যালোজোয়িক যুগের প্রারম্ভে ও মধ্যকালে প্রায় দ্বীপময় ভারত, অর্থাৎ সমুদ্রবিধৌত দক্ষিণ ভারত থেকে আরম্ভ করে হিমালয়ের পাদদেশ পর্যন্ত একটা অবিচ্ছিন্ন ভূভাগ ছিল। এই ভূভাগের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম দিকে টেথিস নামে এক বিশাল সমুদ্র ছিল। কালক্রমে এই সমুদ্রগর্ভ থেকেই হিমালয় পর্বত মাথা খাড়া করে ওঠে। এই সময়ের পূর্ব থেকেই ভারতে অনেকগুলি নদী ছিল। ঐ নদীগুলি তখন উত্তর দিকে প্রবাহিত হয়ে টেথিস সমুদ্রে এসে মিলতো। এই নদীগুলি ভারতের গণ্ডোয়ানা প্রদেশ থেকে রাশি রাশি পলি বয়ে নিয়ে যেতো। এই নদীগুলির জলের তোড়ে গণ্ডোয়ানা প্রদেশের ;জমির উপরকার স্তরগুলি ক্রমশ ধ্বসে তলিয়ে সেখান থেকে লুপ্ত হয়ে নদীর জলের সঙ্গে মিশে পলি হয়ে চলতে থাকতো; ফলে গণ্ডোয়ানা দেশে অনেক উপত্যকা ও মালভূমির সৃষ্টি হয়।

কার্বন যুগের অবসানকালে ভারতে শৈত্যের প্রকোপ হয় ; তালচিরের পাথরের নুড়িগুলি তার সাক্ষ্য। শৈত্যের ফলে উপত্যকার আশেপাশে অবস্থিত উচ্চ মালভূমিগুলির মাথায় বরফ জমতে থাকে। কার্বন যুগের শেষদিকে যখন শৈত্য কেটে যায়, তখন দেশের জলবায়ু আবার উত্তপ্ত হয়ে উঠে। এই সময় ফার্ণ (Fern) জাতীয় উদ্ভিদের জন্ম হয় এবং কালে এরা সারা ভারত ছেয়ে ফেলে। শুধু ভারত নয়, দক্ষিণ আমেরিকা, সাইবেরিয়া প্রভৃতি দেশেও ঐ সময় এই উদ্ভিদেরাই একচ্ছত্র সম্রাট ছিল। পূর্বকথিত উচ্চ জমির বরফগুলি ঐ সময় গলে গিয়ে বড় বড় নদীর সৃষ্টি করে। অরণ্যের উদ্ভিদগুলি উৎপাটিত হয়ে নদীর জলে গা ভাসিয়ে দিতে বাধ্য হয়। গ্লসেপটেরিস ও গ্যাপোপমটেরিস নামক ফার্ণগুলিই ছিল তখনকার দিনের বনানীর প্রধান সম্পদ। মালভূমি ছেড়ে নদীগুলি যখন গণ্ডোয়ানা দেশের উপত্যকায় এসে উপস্থিত হতো, তখন এই সমতলভূমিতে তাদের বেগ কমে গিয়ে তারা ক্ষীণগতি হয়ে পড়তো। তখন এসব মৃত উদ্ভিদের অবশিষ্টাংশগুলির ঘটতো সমাধি। বালি, মাটি ও কঙ্করের পলি দিয়ে ঢাকা পড়ে যেতো তাদের মৃতদেহগুলি।

বায়ুর অভাবে জলের নীচে অবস্থিত এই উদ্ভিদদেহগুলি ঠিক না পচলেও তাদের যে একটা ভীষণ পরিবর্তন হতো, তা অনুমান করা যায়।

উদ্ভিদদেহের প্রধান উপাদান হচ্ছে সেলুলোজ, লিগ্‌নিন এবং মোম ও রজন জাতীয় রাসায়নিক পদার্থ। বৈজ্ঞানিকেরা দেখেছেন যে, এই যুগের লতাপাতা যখন জলাজমিতে পড়ে পচতে থাকে, তখন তাদের দেহের উপাদানগুলি অচিরে জল ও কার্বন-ডাইঅক্সাইডে পরিণতি লাভ করে। সর্বপ্রথমেই সেলুলোজ ও লিগ্‌নিনের পরিবর্তন ঘটে, তার পরে মোম ও রজনের পালা। যে ক্ষেত্রে সেলুলোজ ও লিগ্‌নিনের পূর্ণ পরিবর্তন ঘটে, অথচ মোম ও রজন থেকে যায়, সেখানে তারা মিলে পাইরোলিসিট নামক একপ্রকার পদার্থের সৃষ্টি করে। এর সঙ্গে কয়লার কোন সম্বন্ধ নেই। কিন্তু লতাপাতাগুলি পচবার অবসর পাওয়ার আগেই যদি তার উপর আবার এক পুরু ঝরা পাতার স্তর এসে তাদের ঢেকে ফেলে, তবে বায়ুর অভাবে নীচেকার পাতাগুলির পচনক্রিয়ায় বাধা পড়ে। পচনে বাধা সৃষ্টি হলেও তাদের রূপান্তর হতে থাকে।

ফ্রান্‌জ ফিশার বলেন যে, উদ্ভিদের দেহাবশিষ্ট থেকে প্রথমেই সেলুলোজ অংশটি জীবাণুর প্রভাবে কার্বনডাইঅক্সাইড ও জলে পরিণত হয়। সঙ্গে সঙ্গে

লিগ্‌নিন, মোম ও রজন জাতীয় উপাদানগুলি হিউমিক অ্যাসিডে রূপান্তরিত হয়। পলিমারিজেসন ও অক্সিডেশন নামক রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে হিউমিক অ্যাসিড থেকে হিউমাস নামক পদার্থের উৎপত্তি ঘটে। এটি কাদার ন্যায় এক প্রকার পদার্থ। হিউমাস শুষ্ক হলে পিট্‌ নামক পদার্থে পরিণত হয়। এই পিট্‌ই কয়লার শৈশবাবস্থা।

কোটি কোটি বছর আগে গণ্ডোয়ানা দেশের উপত্যকার উপরে গ্লসেপ-টেরিস ও গ্যাপোপমটেরিস জাতীয় উদ্ভিদের রূপান্তরের ফলে সর্বপ্রথম পিট্‌ জাতীয় একপ্রকার পদার্থের উৎপত্তি হয়। পরবর্তী যুগের পলিসমূহ এই পদার্থ-টির উপর জমে বিরাট বিরাট স্তরের সৃষ্টি করে। এইসব স্তরের চাপ, পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ উত্তাপ, বায়ুর অভাব এবং বদ্ধ জলের উপস্থিতিতে পিট জাতীয় পদার্থটিতে অঙ্গারীভবন-প্রক্রিয়া সুরু হয়। অঙ্গারীভবনের প্রথম অবস্থায় বিটুমেনের উৎপত্তি হয়। উদ্ভিদদেহের প্রোটিন জাতীয় উপাদানের ধ্বংসাবশিষ্টের সঙ্গে মোম ও রজন জাতীয় উপাদানের একত্রীভবনই বিটুমেনের উৎপত্তির কারণ। এই অঙ্গারীভবন প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ পরিণতির ফলেই গাণ্ডোয়ানা অঞ্চলে পাথুরে কয়লার উৎপত্তি হয়েছে।

পাথুরে কয়লা ছাড়া আরও অনেক প্রকার কয়লা আছে। বৈজ্ঞানিকেরা এদের কাউকে অ্যানথ্রাসাইট, কাউকে ব্রাউন কোল, কাউকে লিগ্‌নাইট বলেন। পাথুরে কয়লার মধ্যে গ্যাস-কোল নামক এক প্রকার বিশিষ্ট শ্রেণীর কয়লা আছে।

পিট কয়লায় রূপান্তরিত হবার সময় যদি পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ কোন আগ্নেয়-গিরির সান্নিধ্য লাভ করে, তবে উত্তপ্ত লাভার সংস্পর্শে তা সোজাসুজি অ্যান্থ্রাসাইটে পরিণত হয়। কাশ্মীরে এই জাতীয় কয়লার সন্ধান পাওয়া গেছে।

ব্রাউন কোল বা লিগ্‌নাইটে রজন জাতীয় পদার্থের প্রাচুর্য দেখা যায়। পাথুরে কয়লায় বিটুমেন থাকলেও তুলনায় রজন জাতীয় পদার্থ অনেক কম। কোন রাসায়নিক প্রক্রিয়া এই প্রভেদের কারণ নয়; এই প্রভেদ আসলে বিভিন্ন জাতীয় উদ্ভিদের দেহের উপাদানের বৈষম্যের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। যে সব উদ্ভিদের দেহ থেকে টার্সারি যুগের কয়লার উৎপত্তি হয়েছে, তাদের মধ্যে রজন ও মোমের অংশ অনেক বেশি। টার্সারি যুগের ব্রাউন কোল বা লিগ্‌নাইটকে

পাথুরে কয়লায় রূপান্তরিত করা যায় না ; কাজেই পাথুরে কয়লাকে ব্রাউন কোলের অবস্থার মধ্য দিয়ে আসতে হয়নি, একথা নিশ্চয় করে বলা চলে।

উপরে 'অঙ্গারীভবন' কথাটা ব্যবহার করেছি ; এই অঙ্গারীভবন কথাটায় আমরা কি বুঝি, তা খুলে বলা দরকার। উদ্ভিদদেহের প্রধান উপাদান কি, তা অনেকেই জানেন। সেলুলোজ, লিগ্‌নিন, মোম ও রজন উদ্ভিদদেহের প্রধান উপাদান—একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, কার্বন, নাইট্রোজেন, ফস্‌ফরাস, সালফার—এই মৌলিক পদার্থগুলিই উদ্ভিদের জৈব অংশ সেলুলোজ, লিগ্‌নিন, মোম ও রজনের উপাদান। ক্যালসিয়াম, পটাসিয়াম, সোডিয়াম, সিলিকন, জিঙ্ক, গেলিয়াম প্রভৃতি পদার্থগুলি উদ্ভিদদেহের অজৈব উপাদান।

অঙ্গারীভবনের সময় উদ্ভিদ্‌দেহ থেকে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাস মিলে জলে রূপান্তরিত হয় এবং হাইড্রোজেন ও কিছু কার্বন মিলে মিথেন গ্যাসে রূপান্তরিত হয়ে উদ্ভিদদেহ থেকে বেরিয়ে আসে। এই দুটি পৃথক প্রক্রিয়ার ফলে উদ্ভিদের দেহাবশেষে কার্বনের আধিক্য ঘটে এবং সঙ্গে সঙ্গে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের হীনতা ঘটে।

এইভাবে যখন ক্রমে ক্রমে কার্বনের পরিমাণ বাড়তে থাকে এবং হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের পরিমাণ কমতে থাকে, তখন জল ও মাটির কিছু কিছু জৈব ও অজৈব উপাদানের সঙ্গে উদ্ভিদদেহের উপাদানের বিনিময় হয়। উদ্ভিদদেহের লবণাংশ জলে দ্রবীভূত হয়ে উদ্ভিদদেহ থেকে বেরিয়ে আসে এবং জল থেকে ক্যালসিয়াম প্রভৃতি অজৈব উপাদানগুলি ঐ উদ্ভিদাদেহাবশেষের সঙ্গে মিলে যায়। এছাড়া জলজ জীবের দেহাবশিষ্ট বা জীবাণুর দেহাবশিষ্ট থেকে কিছু গন্ধক ও নাইট্রোজেন এসে উদ্ভিদ দেহাবশেষের সঙ্গে মিশে যায়।

পূর্বে বলা হয়েছে যে, অঙ্গারীভবনের সময় রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে কার্বনের আধিক্য ঘটে। কয়লার দেহ কিন্তু কার্বন হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের সঙ্গে মৌলিক পদার্থরূপে বিরাজ করে। বৈজ্ঞানিকেরা কয়লা থেকে নানাপ্রকার অ্যালিফেটিক হাইড্রোকার্বন নিষ্কাশন করেছেন। অ্যারোমাটিক হাইড্রোকার্বন কয়লার দেহে থাকে না। অ্যালিফেটিক হাইড্রোকার্বনগুলিকে উচ্চ তাপে উত্তপ্ত করলে আরোমেটিকগুলির জন্ম হয়। অঙ্গারীভবনের সময় যে উদ্ভিদের শরীর থেকে মিথেন গ্যাস বেরিয়ে আসে, তার প্রমাণ কয়লার

খনিতেই পাওয়া যায়। আগুনের সংস্পর্শে যাতে মিথেন গ্যাসের বিস্ফোরণ না ঘটে, তার জন্যেই খনিতে নামবার সময় ডেভিস ল্যাম্পের ব্যবহার হয়।

কয়লার ভিতর যে কতকগুলি অজৈব উপাদান এসে জোটে, তা উপরে বলা হয়েছে। এই উপাদানগুলিই ভবিষ্যতে ছাইয়ে পরিণত হয়।

অঙ্গারীভবনের সময় কোন কোন ক্ষেত্রে এমন কতকগুলি হাইড্রোকার্বনের সৃষ্টি হয় যে, কয়লাকে সামান্য মাত্রায় উত্তপ্ত করলে সেগুলি কয়লার দেহ থেকে উবে যায়! ইংরেজিতে এগুলিকে ভলাটাইল বা উদ্বায়ী পদার্থ বলা হয়। যে কয়লায় এগুলির আধিক্য আছে, সেগুলিকেই গ্যাস কয়লা বলা হয়।

পাথরের মত দেখতে হলেও কয়লার শরীরেও কিছু জলীয় অংশ থাকে। সামান্য উত্তপ্ত করলেই কয়লার দেহ থেকে এই জলীয় অংশটা চলে যায়।

কয়লার দেহে গন্ধক থাকে। এরা খানিকটা আসে উদ্ভিদের দেহ থেকে, কতকটা আসে অজৈব খনিজ পদার্থ থেকে। কয়লার দেহে সামান্য পরিমাণ ফস্‌ফরাসও বর্তমান থাকে।

পার্মিয়ান যুগে ভারতবর্ষে যে সব ফার্ণ জাতীয় উদ্ভিদের জন্ম হয়েছিল তাদের মৃতদেহ গাণ্ডোয়ানা দেশে এসে কালক্রমে কয়লায় রূপান্তরিত হবার সুযোগ পেয়েছিল বলে আজ আমরা সেখানে পার্মিয়ান যুগের স্তরের মধ্যেই কয়লা খুঁজে পাই। এই স্তরটাকে তাই ভূতত্ত্ববিদেরা 'বরাকর কয়লা স্তর' বলেছেন। এই স্তরটা বহুদিন পর্যন্ত বিস্তৃত এবং এই স্তর খনন করে যথেষ্ট পরিমাণ কয়লা উত্তোলন করা হয়েছে। এ গেল বরাকরের কয়লার কথা। রাণীগঞ্জ ও ঝরিয়ায় যে কয়লা পাওয়া গেছে, সেগুলি কিন্তু পার্মিয়ান যুগের প্রারম্ভে সে-কালের উদ্ভিদের জীবন্ত কবরের ফলে হয়নি। পার্মিয়ান যুগের শেষ অবস্থায় যে সব উদ্ভিদের অভ্যুত্থান ঘটেছিল এই কয়লাগুলি তাদেরই জীবন্ত সমাধির পর নব কলেবর পরিগ্রহের ফল। বরাকর ও রাণীগঞ্জ কয়লার মধ্যে বয়সের প্রভেদ আছে। রাণীগঞ্জের কয়লা বয়সে ছোট। বরাকর ও রাণীগঞ্জের কয়লা-স্তরের মধ্যে একটা বিশাল কয়লাহীন স্তর আছে—প্রায় ২০০০ ফুট গভীর।

উপরে যেভাবে অঙ্গারীভবনের কথা বলা হলো, তা শুনে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, বরাকর, রাণীগঞ্জ বা ঝরিয়ায় শত শত ফুট গভীর কয়লাস্তরের উৎপত্তি সম্ভবপর হলো কি করে? এই প্রশ্নের উত্তরে বৈজ্ঞানিকেরা বলেন—যে জমির উপর কয়লাগুলির উৎপত্তি হয়েছে, ঐ সময় পৃথিবীর আবরণের সঙ্কোচনের

ফলে ঐ জমিগুলি তখন ক্রমে ক্রমে নেমে যাচ্ছিল। ক্রমনিম্নগামী জমিগুলির উপর ক্রমবর্ধমান উদ্ভিদের ধ্বংসাবশেষের রূপান্তরই ঐ সব গভীর স্তর গঠনের কারণ।

ভারতের কথা ছেড়ে ইউরোপের কয়লার কথা বলতে গেলে বলা যায় যে, সেখানে পার্মিয়ান যুগের পূর্বেকার কয়লা বা কার্বন-যুগে অঙ্গারীভবন ঘটেছিল। পার্মিয়ান ও কার্বন-যুগের উদ্ভিদের মধ্যে পার্থক্য আছে। তাছাড়া ওদেশের কয়লার জন্ম হয়েছে নোনা জলে, আর আমাদের কয়লার জন্ম মিঠা জলে।

কার্বন-যুগে ইউরোপের ভূপৃষ্ঠে যে সব উদ্ভিদ ছিল এবং তাদের মধ্যে যেগুলি জীবন্ত সমাধি লাভ করে কয়লায় রূপান্তরিত হয়েছে, তাদের ভিতর সিজিলেরিয়া (Sigillaria), লেপিডোডেনড্রন (Lepidodendron), ইকুই-সিটাসিন (Equisetaceen) নামক ফার্ণ জাতীয় উদ্ভিদ ও কলোপটেরিস নামক বৃক্ষ জাতীয় ফার্ণের নাম উল্লেখযোগ্য।

উদ্ভিদদেহ কিভাবে পিট্ নামক পদার্থে পরিণত হয়, তা আগেই বলা হয়েছে। কার্বন-যুগে ইউরোপে অনেক জলাভূমি ছিল। এই জলাভূমিগুলি পূর্ব যুগের সমুদ্রেরই চিহ্নাবশেষ। তাই অনেক ক্ষেত্রে এখানকার জল লবণাক্ত। কার্বন যুগে এই জলাশয়ের উপকূলে যে সব উদ্ভিদের জন্ম হয়েছিল, তারা নিকটবর্তী বনানীর চাপে স্বস্থানভ্রষ্ট হয়ে জলাভূমির কূলে এসে জমা হতে থাকে। এর ফলে সমুদ্রোপকূলেই পিটের সৃষ্টি হয়। একদিকে উপকূলে যেমন পিট তৈরি চলতে থাকে, অপরদিকে তেমনি প্ল্যাঙ্কটন (Plankton) নামক জীবাণুর মৃতদেহ জলজ অন্যান্য জীবাণু ও উদ্ভিদের মৃতদেহ, ফুলের রেণু প্রভৃতির সঙ্গে মিশে জলাশয়ের গর্ভে জমা হতে থাকে। ক্রমে নানারূপ রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে জলাশয়ের গর্ভে স্যাপ্রোপেল নামক পদার্থের সৃষ্টি করে। যখন জলজ উদ্ভিদের মূলগুলি জলাশয়ের গর্ভ স্পর্শ করে, তখন সেগুলি পচে গিয়ে স্যাপ্রোপেলের উপর নতুন পিট্ সৃষ্টি করে। যখন পিটের স্তর জমে জমে জলাশয়কে ছেয়ে ফেলে, তখন সেগুলি কয়লায় রূপান্তরিত হবার জন্যে তৈরি হতে থাকে। এক্ষেত্রে এই পিটের স্তরগুলিই কালক্রমে কয়লায় পরিণত হয়েছে।

ইউরোপে উদ্ভিদের দেহাবশেষগুলি তাদের জন্মভূমিতেই জীবন্ত সমাধি লাভ করে কয়লায় পরিণত হয়েছে বলে ওখানকার কয়লাকে Coal formation in Situ বা অটোক্থেনিক কয়লা বলে। অটোক্থেনিক কথাটার মানে

স্বস্থানজ। গণ্ডোয়ানার কয়লা উদ্ভিদের ভাসমান দেহের অবশিষ্টাংশের রূপান্তরের ফলে হয়েছে বলে তাকে Coal formation in drift বা অ্যালোক্থেনিক কয়লা বলা হয়। অ্যালোক্থেনিক কথাটার মানে অনুবাহিত, অর্থাৎ নদীই উদ্ভিদের মৃতদেহগুলিকে অন্য স্থান থেকে বহন করে এনেছে। অষ্ট্রেলিয়া ও ইউরোপে ক্যানেল কোল নামে একপ্রকার কয়লা পাওয়া যায়। একে বগহেড কয়লাও বলা হয়। বগহেড কয়লা থেকে যে পরিমাণ গ্যাস পাওয়া যায়, পৃথিবীতে আর কোন কয়লা থেকে সেই পরিমাণ গ্যাস পাওয়া যায় না। ফ্রান্সের আটুল নামক স্থানে এই কয়লা থেকে পেট্রোলের মত একপ্রকার তেল নিষ্কাশন করা হয়। এই তেলের আধিক্যের জন্যেই ক্যানেল বা বগহেড কয়লার উৎপত্তির সঙ্গে নিম্নস্তরের জলজ প্রাণিদেহের পচন সংশ্লিষ্ট আছে বলে মেনে নেওয়া হয়। এই চাকচিক্যবিহীন কয়লার ভিতর অ্যাল্‌জি নামক একপ্রকার উদ্ভিদের দেহাবশিষ্ট পাওয়া যায়।

কার্বন ও পার্মিয়ান যুগ ছাড়া অন্যান্য যুগের স্তরের পাথুরে কয়লার সন্ধান পাওয়া যায়। পূর্ব এশিয়ার জুরাসিক যুগের স্তরে, ক্যানাডার ক্রিটেসাস যুগের স্তরে এবং আসামে টার্সিয়ান যুগের স্তরে কয়লা ও পাথুরে কয়লার দেখা পাওয়া যায়। ব্রাউন কোলের দেখা পাই অলিগোসিন যুগে এবং লিগ্‌নাইট মায়োসিন ও টার্সারি যুগে। আমাদের নিয়াভেলির লিগ্‌নাইটের জন্ম টার্সারি যুগের স্তরেই সংঘটিত হয়েছে।

মেসোজোয়িক যুগে পৃথিবীর আবরণে অনেক বিপর্যয় ঘটে। তার ফলে গণ্ডোয়ানার কয়লার স্তরগুলিতে অনেক খাঁজ পড়ে যায়। খাঁজ পড়বার ফলে কয়লা-স্তরের কোন কোন অংশ পুরাতন আর্কিয়ান(Archean) ও প্রিক্যাম্ব্রিয়ান যুগের স্তরের মধ্যে ঢুকে যায়। তাই এরা টার্সারি যুগের বায়বীয় ক্ষয় (Aerial erosion) থেকে রক্ষা পায়। এছাড়া মেসোজোয়িক যুগের শেষে পূর্ব দামোদর উপত্যকার স্তরগুলি ভেদ করে পৃথিবীর গর্ভ থেকে এক ধরনের উত্তপ্ত গলিত প্রস্তর বেরিয়ে আসে। এই গলিত প্রস্তর পরবর্তীকালে ঠাণ্ডা হয়ে জমে যায়। ভূতত্ত্ববিদেরা এগুলিকে ডাইক (Dyke) নামে অভিহিত করেছেন। ডাইকগুলি কয়লার স্তরের উপর তাদের প্রভাব বিস্তার করেছে। এই উত্তপ্ত গলিত প্রস্তরের সংস্পর্শে আসবার ফলে কয়লার স্তরের কিছুটা অংশ ঝামায় পরিণত হতে বাধ্য হয়। তাই গণ্ডোয়ানা কয়লার সঙ্গে অনেক ঝামা পাওয়া যায়।

মেসোজোয়িক যুগের শেষ দিকে উত্তর-পশ্চিম ভারতের কতকটা অংশ (পশ্চিম পাঞ্জাব ও দক্ষিণ কাশ্মীর) টেথিস সমুদ্রগর্ভ থেকে উত্তোলিত হয়ে মাথা তুলে দাঁড়ায়। এই ঘটনাটা মেসোজোয়িক যুগের অবসান ও টার্সারি যুগ আরম্ভের মধ্য কালেই ঘটে। ইয়োসিন (Eocine) যুগের প্রারম্ভে (রাণীকোট যুগে) এই নতুন ভূখণ্ডে (সিন্ধু নদের পশ্চিমে কালাবাগে) একটা কয়লা স্তর তৈরি হয়। একেই মাকেরওয়াল কয়লা বলা হয়। ইয়োসিন যুগের শৈশবটা কাটতে না কাটতেই টেথিস সমুদ্র আবার নতুন ভূখণ্ডটাকে জলে ঢেকে ফেলে। সমুদ্রের এই বিচিত্র লীলার ফলে উত্তর ভারতে অনেকগুলি জলাভূমির সৃষ্টি হয়। এই জলাভূমিগুলি উদ্ভিদের দেহাবশেষ থেকে পিট তৈরির সুযোগ এনে দেয়। এর ফলে উত্তর ভারতে কয়লার স্তরের সৃষ্ট হয়। জম্বু ও কাশ্মীর এভাবেই অ্যান্থ্রাসাইট কয়লা এবং সল্ট রেঞ্জ (Salt range), বেলুচিস্তান ও বিকানীরে লিগ্‌নাইটের সৃষ্টি হয়।

আসামের কয়লা সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকদের মত এই যে, ক্রিটেসাস যুগ (Cretacious) অবধি আসাম গণ্ডোয়ানারই অন্তর্ভুক্ত ছিল। ক্রিটেসাস যুগেরই কোন এক সময়ে টেথিস সমুদ্র আসাম দেশটাকেও আক্রমণ করে। এর ফলেই পরবর্তী কালে কতকগুলি জলাভূমির সৃষ্টি হয়। ঐ সব জলাভূমিতে টার্সারি যুগে আসামের কয়লার জন্ম হয়।

পৃথিবীর উপরে সঞ্চিত অধিকাংশ কয়লাকেই বহুস্তর বা ব্যান্‌ডেড কয়লা (Banded coal) বলা হয়। এই কয়লাগুলি জলাশয়ে অবস্থিত পিটেরই (Peat) রূপান্তর। পূর্বে বলা হয়েছে যে, হিউমাস (Humus) শুকিয়ে পিটে পরিণত হয়, কিন্তু পিট তৈরির পূর্বাবস্থায় কবরস্থিত উদ্ভিদগুলি যে পূর্ণমাত্রায় জলসিক্ত ছিল, তা অনুমান করা শক্ত নয়। পিট্ তৈরি হবার জন্যে ঐ পঙ্কিল জলরাশি দুটি কাজ করে থাকে। প্রথমত, অক্সিজেন আগমনের পথ রুদ্ধ করে উদ্ভিদদেহ ধ্বংসকারী জীবাণুদের (Micro-organism) ধ্বংসলীলায় বাধা সৃষ্টি করে এবং দ্বিতীয়ত, উদ্ভিদদেহের পচনের ফলে উৎপাদিত এমন কতকগুলি বিষাক্ত পদার্থকে দ্রবীভূত করে স্থানান্তরিত করে, যেগুলি বাস্তবিকই অঙ্গারীভবনের জন্যে প্রয়োজনীয় জীবাণুগুলির পক্ষে ক্ষতিকর। একথা মনে রাখতে হবে যে, পিটের উপরিস্থিত জলরাশি একটি স্রোতবিহীন বদ্ধ জল মাত্র। বহুস্তর কয়লার দেহটি তার অঙ্গীভূত, স্থূল, সূক্ষ্ম ও অতি সূক্ষ্ম পদার্থের স্তরের

(Band) দ্বারা তৈরি। এরা ঐ কয়লার সংস্তরণ সমতলের (Bedding Plane) সঙ্গে সমান্তরাল রেখায় সজ্জিত থাকে।

বৈজ্ঞানিকেরা এই স্তরগুলিকে তিনটি বিভিন্ন শাখায় শ্রেণীবদ্ধ করেছেন। উদ্ভিদের কাষ্ঠ-অংশ থেকে উদ্ভূত স্তরগুলিকে ভূবিদ্যাবিশারদেরা অ্যান্থ্রাজাইলন (Anthrazylon) বা ভিট্রেন (Vitrain) নাম দিয়েছেন। যে স্তরগুলি উজ্জ্বল, সেগুলিকে ক্ল্যারেন (Clarain) এবং যেগুলি অনুজ্জ্বল, সেগুলিকে ডুরেন (Durain) নামে অভিহিত করেছেন। তাছাড়া অধিকাংশ কয়লার দেহে আর এক প্রকার পাতলা পর্দার ন্যায় অতি সূক্ষ্ম স্তরের উপস্থিতি দেখা যায়। এগুলিকে ফিউজেন (Fusain) বলা হয়। অনেকে এগুলিকে খনিজ কাঠকয়লা (Mineral charcoal) নামেও অভিহিত করেন। এই খনিজ কাঠকয়লা অংশটি বাস্তবিক পক্ষে অঙ্গারীভবনের পথে বহু দূর অগ্রসর অবস্থার ফল। এগুলি কার্বন (Carbon)-বহুল এবং এতে উদ্বায়ী অংশ অতি সামান্য মাত্রায় বিদ্যমান থাকে। এগুলি পঙ্কিল জলাশয়ের উন্মুক্ত পৃষ্ঠে (Surface) অবস্থিত পিট্ থেকে উৎপন্ন হয়। পিটের উপর নানারূপ রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে এগুলি উৎপন্ন হয়ে থাকে। অক্সিডেসন (Oxidation), ডিহাইড্রেসন (Dehydration) এবং ধ্বংসীকরণ—এই তিন প্রকার প্রক্রিয়াই এর উপর চলতে থাকে। থার্মোফিলিক (Thermophilic) জীবাণুরা উত্তাপ সৃষ্টি করে এই জলশায়িত খাণ্ডব দাহন করে, একথাও অনেকে মনে করেন।

কয়লার দেহে এই স্তরীভূত অংশগুলির উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির অনেকগুলি কারণ আছে বলে মনে করা হয়। পিট্‌কে কয়লার অবস্থায় পৌছাতে ধাপে ধাপে অগ্রসর হতে হয়।

প্রথম ধাপটিকে বায়োকেমিক্যাল ধাপ (Biochemical Stage) বলা চলে। বৈজ্ঞানিকেরা দেখেছেন যে, উদ্ভিদের দেহের বিভিন্ন অংশগুলি নিম্নলিখিত অনুক্রমে ধ্বংসের পথে চলে জীবকোষ প্ররস বা প্রোটোপ্ল্যাজম (Protoplasm), ২। পর্ণস্বাদ বা ক্লোরোফিল (Chlorophyl), ৩। তৈলাংশ (Fats and oils), ৪। কার্বোহাইড্রেট (Carbohydrates)—(ক) শ্বেতসার, (খ) কোষাধু বা সেলুলোজ (Cellulose), (গ) লগুড়ি বা লিগ্‌নিন (Lignin), ৫। বাহ্যাবরণ (Epidermis), ৬। উৎস্তর বা কিউটিকল (Cuticle), ৭। বীজাণু বা স্পোর ও পরাগ বাহ্যকবচ বা পোলেন এক্‌সিন্‌স্ (Spores or

pollen exines), ৮। মোম (Wax) এবং ৯। রজন জাতীয় পদার্থ (Resin)।

এদের মধ্যে প্রথম তিন প্রকারের পদার্থগুলি অতি শীঘ্রই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, বাকী অংশগুলি কিন্তু সহজে ধ্বংস হয় না, কারণ পূর্ব তিন প্রকার পদার্থের ধ্বংসের ফলে যে বিষাক্ত রসের সৃষ্টি হয়, তা-ই এগুলিকে কিছুকালের জন্যে ধ্বংস হতে দেয় না। সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস না হলেও যে এদের পরিবর্তন ঘটে না, একথা মনে করলে ভুল হবে। কাষ্ঠতন্তুগুলি (Woody tissue) অ্যানথ্রাজাইলনে পরিবর্তিত হয়ে যায়। ক্রমে যখন চতুর্দিকের জলরাশির বিষাক্ত অংশটি কমে আসে, তখন বাকী অংশগুলি ক্ল্যারেনে পরিবর্তিত হয়। এর পরের অবস্থায় বায়ুবহুল জলের দ্বারা যে ধ্বংসকার্য চলে, তার ফলে কিছু অংশ ডুরেনে পরিবর্তিত হয়। ক্যানেল কয়লার এইভাবে জন্ম হয়েছে।

দ্বিতীয় ধাপটিকে কোলয়ড্যাল ধাপ বলা হয়। লিগ্‌নাইট এবং সাব বিটুমিনাস কয়লাকে (Sub Bituminous Coal) শুকালে সেগুলি সঙ্কুচিত হয়ে যায়। এথেকে অনুমান করা যায় যে, জলও কয়লার অঙ্গের একটি আবশ্যকীয় অংশ। অনেকে মনে করেন যে, পিট্ আসলে একপ্রকার করিলয়ন (Hydrosol), যা পরে জলশ্‌লিষকে (Hydogel) পরিণত হয়ে নিম্ন শ্রেণীর কয়লার সৃষ্টি করে।

চরম অবস্থায় পিট্ যে শ্লেষ্মাজাতীয় (Colloidal) অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তা ধারণা করবার পথে কোন বাধা উপস্থিত হয় না। শ্লেষ্মাজাতীয় অবস্থা থেকে জল নিষ্কাশিত হয়ে গেলে পিট্ লিগ্‌নাইটে পরিবর্তিত হয়।

নিপীড়গতি রাসায়নিক পরিবর্তনকে (Dynamo-chemical) তৃতীয় বা শেষ ধাপ বলা চলে। এই ধাপে চাপ ও উত্তাপ অঙ্গারীভবন-প্রক্রিয়ার প্রধান কারণ বলে গণ্য হয়। অনেকে মনে করতে পারেন যে, চাপ ও উত্তাপের তারতম্যের উপরই কয়লার শ্রেণী (Rank) নির্ভর করে। আসলে চাপ, উত্তাপ ও সময়—এই তিনটির সমন্বয়ের ফলেই বিভিন্ন শ্রেণীর কয়লার সৃষ্টি হয়।

অতীতে কয়লার ব্যবহার

কোন্ সুদূর অতীতে যে ইন্ধন হিসাবে কয়লার ব্যবহার ঘটেছে, তা নিশ্চয় করে বলা শক্ত। চীনের ইতিহাস পড়লে জানা যায় যে, প্রায় দু-হাজার বছর পূর্বেও সে দেশে কয়লার ব্যবহার হতো। খৃঃ পূর্ব ৩২৫ সালে গ্রীস দেশেও কয়লার ব্যবহার হতো—থিওফ্রাষ্ট (Theofrast) সে কথা লিখে গেছেন। ভারতেও যে কয়লার ব্যবহার বহুকাল পূর্বেই বিদিত ছিল, তা ধরে নেওয়া যেতে পারে ; কিন্তু তখন জনসাধারণের উনুনে কয়লা ইন্ধনরূপে ব্যবহৃত হতো না, তাও ধরে নেওয়া অযৌক্তিক হবে না। এর কারণ এই যে, তখনও পর্যন্ত মানুষ গভীর খনি খননবিদ্যা আয়ত্ত করতে পারেনি। জমি ধ্বসে গিয়ে বা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়ে যে সব স্থানে কয়লার স্তরগুলি পৃথিবীর গভীর গর্ভ থেকে লোকচক্ষুর সামনে এসে অনাবৃত হয়ে দাঁড়াতো, সেখান থেকেই সামান্য সংগ্রহ করে মানুষ কয়লাকে নিজেদের কাজে লাগাতো। ঐ অতীত যুগে তখনও পর্যন্ত কয়লা ইন্ধন হিসাবে জনসাধারণের চুল্লীতে ব্যবহৃত হয়নি।

ইউরোপের ইতিহাস পড়লে জানা যায় যে, জার্মেনীর আখেন (Aachen) নগরের নিকট অগাষ্টিন মঠের মঙ্কেরা (Monks) ১১১৩ সালে প্রথম কয়লার খনি খনন করেন। এর কিছুদিন পরে ইংল্যাণ্ডে কয়লার খনির সূত্রপাত হয়। এরপর থেকেই ইউরোপের নানাস্থানে কয়লার খনি থেকে কয়লা উত্তোলনের কাজ সুরু হয়। কিন্তু তখনও পর্যন্ত কয়লার ব্যবহার সীমাবদ্ধ ছিল, কারণ কয়লাকে স্থানান্তরিত করবার জন্যে তখনও পর্যন্ত রেলগাড়ীর আবিষ্কার হয়নি।

এই সময় লোহা তৈরির কাজটা প্রায় সব দেশেই প্রচলিত ছিল। কিন্তু লোহা-পাথর গলাবার জন্যে তখনও কাঠকয়লারই ব্যবহার হতো। ১৬১৮ সালে ডড্‌লেই সর্বপ্রথম লোহা তৈরির জন্যে কয়লার ব্যবহার করেন। কিন্তু পাথুরে কয়লার ব্যবহারে যে লোহা তৈরি হয়, তা কাঠকয়লার ব্যবহারে তৈরি লোহার চেয়ে নিকৃষ্ট। ১৭৩৩ সালে ডার্বিই (Derby) প্রথম লোহা গলাবার জন্যে কোক্ ব্যবহার করেন। কোক্ ব্যবহার করবার ফলে যে লোহা তৈরি হয়, তা কাঠকয়লার সাহায্যে তৈরি লোহার চেয়ে অনেক বিষয়ে উৎকৃষ্ট

প্রমাণিত হয়েছে। ১৭৬০ সালে বাষ্প-শক্তির আবিষ্কারক James Watt একখানা Blowing ইঞ্জিন তৈরি করবার জন্যে কোক্ ব্যবহার করেন। ১৮১১ সালে Middleton Colliery থেকে কয়লা বহনের জন্যে রেললাইন পাতা হয়। ১৮১৩ সালে টাইনের (Tyne) নিকট ভাইলাম খনিতে কয়লা বহনের জন্যে রেলগাড়ীর ব্যবহার হয়। ১৮৭৬ সালে Blast Furnace-এ সর্বপ্রথম কোকের ব্যবহার হয়। ১৮২৫ সালে আমেরিকায় কয়লা বহন করবার জন্যে রেলগাড়ীর ব্যবহার হয়। কয়লাকে কার্বোনিজেসন (Carbonisation) নামক প্রক্রিয়ার দ্বারা কোকে পরিণত করা সর্বপ্রথম জার্মেনীতেই স্বুরু হয়। ১৫৮৪ সালে ঐ দেশে এর স্বত্রপাত হয়। ১৬০০ সালে ইংল্যাণ্ডে কার্বোনিজেসনের প্রচলন হয়। বেসার ও সার্লি (Bacher & Serli) কার্বোনিজেসন প্রক্রিয়ার ফলে উদ্যোগিক ব্যবহারের উপযোগী যে সব আনুষঙ্গিক পদার্থগুলি (By-Products) উৎপন্ন হয়, তা থেকে 'পিচ' ও আলকাত্‌রা তৈরি করেন। সেণ্ট এটিয়েন (St. Etienne) নামক ফ্রেঞ্চ সহরের নিকট ক্ল্যাব (Knab) উক্ত প্রক্রিয়ার ফল স্বরূপ আনুষঙ্গিক পদার্থ হিসাবে অ্যামোনিয়া ও আলকাত্‌রা উৎপাদন করেন। ১৭৮৬ সালে ডুয়োডোনাল্‌ড্ (Duodonald) কৃত্রিম আলো পাবার জন্যে কোল্ গ্যাস ব্যবহার করেন। Abbeysan Peters Menekler ঐ একই উদ্দেশ্যে কোল্ গ্যাস ব্যবহার করেন। ১৭৯২ সালে মারডক (Murdock) বার্মিংহামের নিকটবর্তী সোহো (Soho) নামক স্থানে প্রথম গ্যাসের কারখানা স্থাপন করেন এবং ১৮১০ সালে ক্লেগ (Clegg) গ্যাসের মাধ্যমে রাস্তা আলোকিত করেন। ১৮৮১ সালে হুসেনার (Hussener) জার্মেনীর গেলসেনকির্সে্ন (Gelsenkerchen) নামক স্থানে সাইমন কার্ভেস (Simon Carves) কোক চুল্লীর (Coke wovens) প্রবর্তন করে আনুষঙ্গিক পদার্থ সংগ্রহের পথ সহজ করে দেন। ১৮৮২ সালে গ্লাইডিজ (Gliwitz) নামক স্থানে Coke oven battery-র প্রচলন হয়। ১৮৮৪ সালে ব্র্যাঙ্ক (Branck) কোল গ্যাস থেকে বেঞ্জল (Benzol) সংগ্রহ করেন।

কয়লা থেকে কোল গ্যাস, কোক, বেঞ্জল (Benzol), আলকাত্‌রা প্রভৃতি আরও কত দ্রব্য পাওয়া যায়, তা পরে বিশদভাবে আলোচনা করা হবে।

ভারতে ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের সময়ে ১৭৭৪ সালে প্রথম কয়লার খনি খনন

করবার অনুমতি দেওয়া হয়। ঐ সময় রাণীগঞ্জের ডিসেরগড় সিমে এবং নাগা রাণীগঞ্জ সিমে খনন-কার্য স্থরু করা হয়। ১৭৭৫ সালে কয়েক হাজার মণ কয়লা উত্তোলন করা হয় এবং তাথেকে আড়াই হাজার মণ গভর্ণমেন্টকে দেওয়া হয়। অবশ্য কয়লাগুলি অতি নিকৃষ্ট ধরনের। আশাপ্রদ কয়লা না পাওয়ায় ১৮১৪ সাল অবধি, অর্থাৎ প্রায় ৪০ বছর পর্যন্ত আর কোন নতুন খনি খননের চেষ্টা হয়-নি। ১৮১৪ সালে রাণীগঞ্জের ইগারে খনি খনন করা হয়। এবারেও আশানুরূপ ভাল কয়লা পাওয়া যায়নি। ১৮২০-২৫ সালের মধ্যে দামোদর নদের ধারে সীতারামপুর ও চিনাকুরির মধ্যে অনেকগুলি খনি খনন করা হয়। চাঁচ নামক স্থানে বরাকর সিমের কয়লার জন্যে খনি খোলা হয়। ১৮৪৫-৪৬ সালে প্রায় পঞ্চাশটি খনিতে কাজ চলতে থাকে। ১৮৫৮-৬০ সালের মধ্যে বার্ষিক প্রায় ২৮০,০০০ টন কয়লা খনিগর্ভ থেকে উত্তোলন করা হয়।

১৮৫৫ সালে ভারতে প্রথম রেলগাড়ীর প্রবর্তন হয়। ঈষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে নামে যে লাইনটি পাতা হয়েছিল, সেটা কলকাতা থেকে রাণীগঞ্জ এসেই শেষ হয়েছিল। এই রেল লাইনে রেলগাড়ী চলাচল হওয়ায় খনি থেকে কয়লা উত্তোলন ব্যবসায়টা খুব বেড়ে গিয়েছিল। ১৮৬৮ সালে রাণীগঞ্জ এলাকার খনি থেকে প্রায় পাঁচ লক্ষ টন কয়লা তোলা হয়। যত কয়লা ঐ সময় তোলা হতো, একা রাণীগঞ্জ এলাকাই তার শতকরা ৮৮ ভাগ কয়লা খনন করতো। উনবিংশ শতাব্দীতে রাণীগঞ্জ থেকেই কোল সরবরাহ হতো। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে ঝরিয়া এলাকায় বরাকর স্তরের অতি উৎকৃষ্ট কয়লার সন্ধান মেলে। ১৯০৬ সালে ঝরিয়ার কয়লা উত্তোলনের পরিমাণ রাণীগঞ্জের সংখ্যাকে ছাড়িয়ে যায়। ইতিমধ্যে গিরিডি ও কারহারবাড়ীতেও উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কয়লা পাওয়া গেল। এসব অঞ্চলে রেলগাড়ীর প্রচলনের ফলে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কোকিং কয়লা উত্তোলনের হার বেড়ে যায়। বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এই অঞ্চল থেকে প্রায় এক মিলিয়ন টন কয়লা তোলা হয়। রাজমহল ও ড্যালটনগঞ্জ এলাকাতেও কয়লার সন্ধান পাওয়া যায়।

মধ্য ভারতের রেওয়া স্টেটের উমরিয়া নামক স্থানে একটি কয়লার খনি খনন করা হয়। ১৯০০ সালে এখান থেকে প্রায় তিন লক্ষ টন কয়লা উত্তোলন করা হয়।

মধ্যপ্রদেশে মোপানিতে কয়লার খনির সন্ধান পাওয়া যায় এবং সেখানে

খনন-কার্য আরম্ভ করা হয় ১৯৫০ সালে। এখানে মাত্র ৪০ হাজার টন কয়লা উত্তোলন করা হয়।

হায়দরাবাদে সিদারাণীতে কয়লার খনির সন্ধান মেলে ও সেখানেও খনন-কার্য স্বরু হয়। ১৯০০ সালে এখান থেকে প্রায় চার লক্ষ টন কয়লা তোলা হয়। ১৯০৮ সালে বোকারোতে এবং ১৯১২ সালে রামপুরে কয়লার খনি খনন করা হয়।

১৮৮১ সালে আসামের নামডাং ও লেডো নামক খনি থেকে কয়লা তোলা হয়েছিল।

ইউরোপ ও ভারতে কয়লা উত্তোলনের কথা আলোচনা করবার সময় একটা ব্যাপার আমাদের চোখে পড়ে। ইউরোপে রেলগাড়ীর প্রথম প্রবর্তন হয়েছিল কয়লাকে দেশ-বিদেশে চালান করবার জন্যে; আর ভারতে রেলগাড়ী চালাবার জন্যেই কয়লার খনির কাজ আরম্ভ হয়। অবশ্য রেলগাড়ী চালাবার জন্যে ইউরোপে যে কয়লার আদর হয়নি, তা মনে করা ভুল হবে।

কয়লাখনি ও রেলগাড়ীর প্রচলন হবার পর ভারতে জনসাধারণের উন্থনে যাতে কয়লা ইন্ধন হিসাবে চালু হয়, তার জন্যে চেষ্টা চলতে থাকে। পাথুরে কয়লা জ্বালাবার সময় ভীষণ ধোঁয়ার সৃষ্টি হয় বলেই গৃহকর্ত্রীরা কাঠ বা কাঠের কয়লা বা ঘুঁটেই বেশি পছন্দ করতেন। কয়লা যাতে চালু হতে পারে, তার জন্যে খনির মালিকেরা সফ্‌ট কোক তৈরি আরম্ভ করেন। ভারতে এই সফ্‌ট কোক তৈরির ব্যাপারে কোন নিয়ম-কানুন ছিল না বা নেই। খনির মালিকেরা নিজেদের খেয়ালমত একটা খোলা জায়গায় রাশীকৃত কয়লায় আগুন ধরিয়ে দেন। এর ফলে কতকগুলি কয়লা আধপোড়া থেকে যায়, কতকগুলি পুরাপুরি-ভাবে পুড়ে যায়, আবার কতক ছাই হয়ে যায়। মোট কথা আগুন নেবাবার পর যা পাওয়া যায়, তাকে সফ্‌ট কোক বলা হয়। এই প্রক্রিয়ার ফলে কয়লা থেকে অনেক মূল্যবান অংশ ধোঁয়ার আকারে বেরিয়ে যায়। যে প্রথায় আমাদের দেশে সফ্‌ট কোক তৈরি হয়, তাকে কয়লার অপচয় বলা চলে। আমাদের খনির মালিকদের অজ্ঞতার ফলে কয়লার ভিতরকার মূল্যবান সম্পদ ধোঁয়া করে ছেড়ে দিয়ে তাঁরা শুধু নিজেদের নয়, সমগ্র জাতির আর্থিক ক্ষতি করছেন। জনসাধারণের উন্থনে ব্যবহারের জন্যে এমন ধরনের কয়লা থেকে ইন্ধন তৈরি করতে হবে, যা ধোঁয়াশূন্য। ধোঁয়ার রূপ নিয়ে যে মূল্যবান সম্পদ

উবে যায়, তাকে পূর্বেই বের করে নিতে হবে। কিন্তু তা বলে উদ্বায়ী পদার্থ নিঃশেষ করে বের করে নেওয়া চলবে না, অন্তত এই ইন্ধনে শতকরা ৭-১০ ভাগ উদ্বায়ী পদার্থ রেখে দিতে হবে। ইন্ধন যাতে রেলগাড়ী ও কয়লার ডিপোতে কম স্থান অধিকার করে, তার ব্যবস্থাও করতে হবে ; অর্থাৎ ইন্ধনটির অংশগুলি ঘন সন্নিবিষ্ট ও বেশ খানিকটা শক্ত হওয়া চাই এবং এতে ছাইয়ের অংশ কম হওয়া চাই। ইউরোপে কয়লাকে ৬০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে কার্বোনাইজ করে 'কোলিট' প্রভৃতি নাম দিয়ে এরূপ ইন্ধন প্রস্তুত করা হয়েছে। লো-টেম্পারেচার কার্বনিজেসন অর্থাৎ ৫০০ ডিগ্রীতে কার্বনিজেসন করে জার্মেনীতে কয়লা থেকে ঐরূপ ইন্ধন তৈরি করা হয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বিহার গভর্ণমেণ্ট ঈষ্ট এনা (East Ena) খনিতে ঐ প্রথায় সফ্‌ট্‌ কোক তৈরির জন্যে একটা কারখানা খুলেছিলেন, কিন্তু তাঁদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

ভারতে কয়লার খনি ও কি ধরনের কয়লা পাওয়া যায়, তার হিসাব

ভারতে সর্বসমেত ১১১৪টি কয়লার খনি আছে। এদের মধ্যে গড়পড়তা মাসিক ৮২০টি খনিতে কাজ হয়। কয়লা মিলিয়ন টন হিসাবে উত্তোলিত হয়। লৌহ (Iron Ore), মাঙ্গানিজ পাথর (Manganese Ore), তামা পাথর (Copper Ore), চায়না মাটি (China clay), ফায়ার ক্লে (Fire clay) লবণ ও চুনা পাথর (Lime stone) মাত্র হাজার টন হিসাবে খনি থেকে উত্তোলন করা হয়।

ভারতে ১৯৫৬ সালে ৩৯ মিলিয়ন টন ও ১৯৫৭ সালে ৪৫ মিলিয়ন টন কয়লা উত্তোলিত হয়। এর মূল্য প্রায় ৬·৩৫ মিলিয়ন রুপীজ। এর মধ্যে গণ্ডোয়ানার কয়লাই প্রায় ৩৮·৮ মিলিয়ন টন, অর্থাৎ শত ভাগের ৯৮·৫ ভাগই গণ্ডোয়ানার কয়লা। বাকীটা টার্সারি যুগের কয়লা।

গণ্ডোয়ানা কয়লার ৮১·৫ ভাগ বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা, ১২·৫ ভাগ মধ্য-প্রদেশ, ৪·৫ ভাগ অন্ধ্রপ্রদেশ ও ১·৫ ভাগ আসাম ও রাজস্থান স্টেটের খনি থেকে উত্তোলিত হয়।

১৯৫৬ সালে বাংলা দেশ থেকে ১১২৯০০০ টন (দাম ১৮২ মিলিয়ন রুপীজ)

এবং বিহার থেকে ২০০৯২০০০ টন (দাম ৩০৫·৬ মিলিয়ন রুপীজ) কয়লা সরবরাহ করা হয়।

৩৯ মিলিয়ন টন কয়লার মধ্যে ৩৫ মিলিয়ন টন ভারতের চাহিদা।

এই ৩৫ মিলিয়ন টন কিভাবে খরচ হয়, তার একটা খসড়া হিসাব দেওয়া যেতে পারে। ১৯৫৬ সালে ভারতীয় রেলওয়ে ১২ মিলিয়ন, লোহার কারখানা ৩·৫ মিলিয়ন, বৈদ্যুতিক শক্তি কেন্দ্র ২·৭, কাপড়ের কল ১·৯, সিমেণ্ট তৈরির জন্যে ১·৫, ইট তৈরির জন্যে ১·৫, কাগজের কলের জন্যে ০·৫, পাট কলের জন্যে ০.৫, কেমিক্যাল ফ্যাক্টরির জন্যে ০·২, দেশী বাষ্পীয় বঙ্কারের জন্যে ০·২ এবং গ্যাস তৈরি, জনসাধারণের উনুন ও অন্যান্য কারণে ১০ মিলিয়ন টন কয়লার ব্যবহার হয়েছে।

এর মধ্যে ৪·৩ মিলিয়ন টন কয়লাকে কোকে পরিণত করা হয়েছে। এই কোকের মধ্যে আবার ১·৮ মিলিয়ন কাঁচা কোক (Soft Coke) ও ২·৫ মিলিয়ন টন পাকা কেক (Hard Coke)। প্রতি বছর যে পরিমাণ কয়লা উত্তোলন করা হয়, তার মধ্যে ৮ মিলিয়ন টন কয়লা থেকে লোহার কারখানা লোহা পাথর গলাবার উপযোগী কোক তৈরি হতে পারে। কিন্তু এর অর্ধেকটা অর্থাৎ প্রায় ৪ মিলিয়ন টন লোহা পাথর গলাবার জন্যে কোকে পরিণত করা হয়। ১৯৫৬ সালে প্রার ১·৭ মিলিয়ন টন এরূপ পাকা কয়লা (Hard Coke) কার্বোনিজেসন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তৈরি করা হয়েছিল।

ভারতে ঔদ্যোগিক পরিকল্পনা প্রসারিত হবার ফলে কয়লার চাহিদা যেরূপ বেড়ে যাচ্ছে, তাতে মনে হয় ১৯৬০-৬১ সালে ৬০ মিলিয়ন টন কয়লার চাহিদা হবে। দুর্গাপুর, ভিলাই রুরকেলায় (Durgapur, Bhilai % Rourkela) লৌহ ও ইস্পাত তৈরির জন্য অনেক কোক তৈরি করতে হবে। এক দুর্গাপুরেই বছরে ৩২৫ হাজার টন কোক তৈরির পরিকল্পনা করা হয়েছে। রুরকেলাতে বছরে ১·৬ মিলিয়ন টন কার্বোনাইজ করে কোক তৈরি হবে। ভিলাইতে বছরে প্রায় ১·৩ মিলিয়ন টন কোক তৈরি হবে। জামসেদপুরে টাটা কোম্পানীর কারখানায় প্রতিদিন প্রায় ৬৮০০ টন কয়লা কার্বোনাইজ করে ৪৪০০ টন কোক তৈরি হয়। নানাস্থানের ও নানাস্তরের কয়লা থেকে আমরা সমান পরিমাণে উত্তাপ পেতে পারি না ; কারণ বিভিন্ন কয়লার দেহে অঙ্গারের যে সব যৌগিক পদার্থ অছে, তাদের তারতম্য এবং অজৈব পদার্থের

(Inorganic ash) অংশের তারতম্যের উপর উত্তাপ-শক্তির পরিমাণ নির্ভর করে। জৈব পদার্থের মধ্যে একটা অংশ ,স্থায়ী তাকে স্থায়ী বা ফিক্সড্ কার্বন বলা হয়। অপর অংশটা উদ্বায়ী অর্থাৎ স্বল্পতাপেই পলায়মান। একে ভলা-টাইল ম্যাটার বলা হয়েছে। অজৈব পদার্থের মধ্যে ছাই ও জলীয় অংশকে গণ্য করা হয়। জৈব পদার্থের রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ার উপরই প্রধানত কয়লার উত্তাপ-শক্তি নির্ভর করে।

নীচে কতকগুলি কয়লার বিশ্লেষণের ফল দেওয়া হলো :—

	ঝরিয়ার কয়লা					গিরিডির কয়লা
	১০নং সিম	১১নং „	১২নং „	১৪নং „	১৫নং „	রামনাধি খনি
জলীয় অংশ	১·১৮	০·৬০	১·১৮	১.৫২	১·২৩	১·০২
উদ্বায়ী অংশ	১৭·৪৮	১৯·৯২	২৩·১৫	২০·১০	২১.৯৩	২৪·৬০
ছাই	২৪·৬০	১৮·৮২	৭·০৮	১২·৮০	১৩·১৬	৮·৫৪
স্থায়ী কার্বন	৫৬·৭৪	৬০·৬৬	৬৮·৫১	৬৫·৫৮	৬৩·৬২	৬৫·৮৪

রাণীগঞ্জের কয়লা

	দিসেরগড়	বানটাটি	নিলগাঁ	ঘুস্নিক	লাইকাডি তিভ্রেন	লাইকাডি ডুরেন	বাড় নেমো চুরুলো
জলীয় অংশ	২·৬০	৩·২৪	৪·২৮	৫·৩০	১·৯০	১·৬১	২·০০
উদ্বায়ী অংশ	৩০·০২	২৯·৩২	৩৫·৪৩	৩২·০৪	২৯·৭৫	২৫·৫৩	২০·৬০
ছাই	১০·৪৫	১১·১২	১২·০০	১০·৫০	৪·২০	১৮·৪৩	৯·০০
স্থায়ী কার্বন	৫৬·৯৩	৫৬·৩২	৫৩·৬১	৫২·১৬	৬৪·২০	৫৪·৮১	৬৭·৬

দামোদর উপত্যকায় কয়লাগুলি পোড়ালে পাউণ্ড প্রতি ১১০০০ থেকে ১৩০০০ বি. টি. ইউ. উত্তাপ-শক্তি পাওয়া যায়, একথা আগেই বলা হয়েছে।

কয়লার শ্রেণীবিভাগ

রেনেঁা (Regnault) বিশ্লেষণ ফলের উপর নির্ভর করে কয়লাকে নিম্নলিখিত পাঁচ ভাগে ভাগ করেছেন।

১। অ্যান্থ্রাসাইট (Anthracite)

২। লিন বা খর্ব শিখা বিটুমিনাস কয়লা (Lean or short flame bituminous)

৩। বিটুমিনাস স্মিথি (Bituminous smithy coal)

৪। উচ্চ শিখা বিটুমিনাস (Long flame bituminous)

৫। শুষ্ক উচ্চ শিখা (Dry long flame)

প্রোফেসর বোন (Bone) কিন্তু অন্যভাবে কয়লাকে শ্রেণীবদ্ধ করেছেন। তিনি যে ভাবে ভাগ করেছেন, তা নিম্নে দেখানো হলো।

ননকোকিং

১। লিগ্‌নাইট—	(কোক তৈরি হয় না)	রিভাবারেটেরি ফার্নেসে এর ব্যবহার হয়।
২। বিটুমিনাস—	(ক) কোক তৈরি হয় এবং উচ্চ শিখা	এই কয়লা থেকে গ্যাস তৈরি হয়।
	(খ) ঠাসা কোক তৈরি হয়।	এথেকে কোক তৈরি হয়।
	(গ) ঠাসা কোক ও উচ্চ শিখা	বয়লারে ব্যবহৃত হয়।
৩। সেমিটিমিনাস	ননকোকিং কোক তৈরি হয় না খর্ব শিখা	—বয়লারে ব্যবহৃত হয়।
৪। অ্যান্থ্রাসাইট বা অ্যান্থ্রাসাইটিক	ননকোকিং ,,	জনসাধারণের উনুনে ব্যবহৃত হয়।

এদের উদ্বায়ী পদার্থের স্থায়ী কার্বনের হার পরিশিষ্টে দেখানো হয়েছে।

আমেরিকান ষ্ট্যাণ্ডার্ড অ্যাসোসিয়েশনের (A.S.T.M.S.) শ্রেণীবিভাগ অনুযায়ী কয়লাকে ৪ ভাগ করা হয়েছে।

১। অ্যানথ্রাসাইট। ৩। সাববিটুমিনাস।
২। বিটুমিনাস। ৪। লিগ্‌নাইট।

অ্যানথ্রাসাইটকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে ; যথা—মেটা, নর্মাল, এবং সেমিঅ্যানথ্রাসাইট। বিটুমিনাসকেও ৫ ভাগে ভাগ করা হয়েছে ; যথা—কম উদ্বায়ী, মাঝারি উদ্বায়ী ও অধিক উদ্বায়ী এ. বি ও সি। সাববিটুমিনাসকে তু-তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে ; যথা—বিটুমিনাস এ. বি ও সি। লিগনাইটকে তু-ভাগে ভাগ করা হয়েছে ; যথা—লিগ্‌নাইট ও ব্রাউন কোল। এদের অন্যান্য গুণাবলীব বিষয় পরিশিষ্টে বলা হয়েছে।

ভারতীয় কোল গ্রেডিং বোর্ড কিন্তু একটা সহজ শ্রেণীবিভাগ করেছেন। নিম্নে তাঁদের বিভাগ দেখানো হলো।

১। সিলেক্টেড ৩। সেকেণ্ড
২। ফার্স্ট ৪। থার্ড

প্রত্যেক শ্রেণীকে আবার ২ ভাগে ভাগ করা হয়েছে—কম উদ্বায়ী ও অধিক উদ্বায়ী।

ভূগর্ভে আমাদের এই অমূল্য সম্পদ কি পরিমাণ আছে, বৈজ্ঞানিকেরা তার একটা হিসাব করেছেন।

খনন-কার্য পরিচালনা করা যায়, এমন সব খনির হিসাব—

		মিলিয়ন টন
রাণীগঞ্জ, দুর্গাপুর, বোখারো ও করমপুরাতে		২৫০০০
শোন উপত্যকা, আউরাঙ্গা থেকে উমরিয়া, সোহাগপুরে		১০০০০
ছত্রিশগড় ও মহানদী উপত্যকায়	...	৫০০০
গিরিডি, দেওঘর ও রাজমহল পর্বতে	...	৩৫০
মোহপানি, কাম্থান ও পার্বত্য উপত্যকায়	...	১৫০০
ওয়ার্ধা ও গোদাবরী উপত্যকায়	...	৮০০০
দার্জিলিং পাহাড়ের পাদদেশ ও পূর্ব হিমালয়ে	...	১৫০
	মোট	৫০,০০০ মিলিয়ন টন

এগুলি সবই হাজার ফুটের মধ্যে গভীর খাদে অবস্থিত। এর মধ্যে যদি ৪ ফুট বা ৪ ফুটের চেয়ে মোটা সিম ও শতকরা ২৫ ভাগের চেয়ে বেশি ছাইযুক্ত নয়—এমন সব কয়লাকেই ধরা হয়, তবে তাদের মোট পরিমাণ ২০০০০ মিলিয়ন টনের বেশি হয় না।

উৎকৃষ্ট কয়লার হিসাব

গিরিডি এবং জয়ন্তী	...	৪০	মিলিয়ন টন
রাণীগঞ্জ	...	১৮০০	,,
ঝরিয়া	...	১২৫০	,,
বোকারো	...	৮০০	,,
করণপুরা	...	৭০০	,,
হুটার, জোজিলা এবং ববহার	...	৫০	,,
কুবাসিয়া, ঝিলিমিলি প্রভৃতি	...	৩০	,,
তালচের থেকে কর্বা পর্যন্ত	...	২০০	,,
বল্লারপুর, সিদ্দাবেণী	...	৫০	,,
কাম্থান ও পাঞ্চ উপত্যকা	...	৩০	,,
	মোট	৪৯৫০	

এর মধ্যে ৩৫০০ টন কয়লা ভূগর্ভের ১০০০ ফুট নীচে এবং বাকী টা ১০০০ থেকে ২০০০ ফুট গভীর খাদে অবস্থিত।

কোক তৈরির উপযুক্ত কয়লা

এই কয়লাগুলি থেকে ধাতব প্রস্তর গলাবার উপযুক্ত কোক তৈরি হয়। এগুলি গণ্ডোয়ানার নিম্নস্তরের সম্পত্তি। বাংলা ও বিহার অঞ্চলে, বিশেষত ঝরিয়া, রাণীগঞ্জ, গিরিডি ও বোকারোতে এরা সীমাবদ্ধ।

রাণীগঞ্জে	...	২৪১	মিলিয়ন টন
ঝরিয়াতে	...	৯০০	,,
গিরিডিতে	...	৩৮	,,
বোকারোতে	...	৫১৫	,,
	মোট	১৬৯৪	মিলিয়ন টন

এর মধ্যে প্রায় ১১০০ মিলিয়ন টন ১০০০ ফুট পর্যন্ত গভীর খাদের মধ্যে নিহিত।

এছাড়া টার্সারি যুগের কয়লা আছে। ঐ কয়লাগুলির হিসাব নিম্নে দেওয়া হলো—

আপার আসামে	...	১০০০ মিলিয়ন টন
খাসি ও গারো পাহাড়	...	১০০০ ,,
পাঞ্জাব, কাশ্মীর, বেলুচিস্তান ও এন. ডাবলিউ. পি-তে	...	২০০ ,,
বিকানীরে	... ...	১০০ ,,
	মোট	২৩০০ মিলিয়ন টন

আধুনিক সার্ভের ফলে জানা গেছে যে, মাত্র রাণীগঞ্জ ও ঝরিয়া খাদে ১২,০০০০ মিলিয়ন টন কোকিং কয়লা মজুত আছে।

আধুনিক যুগে কয়লার ব্যবহার

আধুনিক যুগে উত্তাপ-শক্তির আধার হিসাবেই প্রথম কয়লার ব্যবহার হয়েছে। তাই এক্ষেত্রে কয়লার মূল্য উত্তাপ-শক্তির পরিমাণের উপরই নির্ভর করছে। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, কয়লার উৎপত্তির কারণ উদ্ভিদদেহের রূপান্তর গ্রহণ। উদ্ভিদদেহের প্রধান উপাদান যে সেলুলোজ, লিগ্‌নিন, মোম ও রজন জাতীয় জৈব পদার্থ, তাও বলা হয়েছে। এই উপাদানগুলি যে অঙ্গারের (Carbon) যৌগিক পদার্থ, তা হয়তো অনেকেই জানেন। উদ্ভিদেরা বায়ু থেকে কার্বন-ডাইঅক্সাইড সংগ্রহ করে ক্লোরোফিল নামক সবুজ পদার্থ ও সূর্য-রশ্মির সাহায্যে প্রথমে শর্করা (Sugar) জাতীয় পদার্থ ও পরে সেলুলোজ প্রভৃতি উপাদান গড়ে তুলে শরীর পুষ্ট করে। উদ্ভিদদেহে সূর্যরশ্মির উত্তাপ-শক্তি রাসায়নিক শক্তিতে পরিণত হয়ে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার পথ সহজ করে দেয়। উদ্ভিদদেহ অর্থাৎ কাঠ বা তার রূপান্তর কয়লাকে পোড়ালে, অর্থাৎ উদ্ভিদদেহের প্রধান উপাদান অঙ্গারের সঙ্গে বায়ুর প্রধান অংশ অক্সিজেনের সঙ্গে রাসায়নিক প্রক্রিয়া ঘটিয়ে দেবার ফলে উত্তাপ-শক্তি বেরিয়ে আসে। এজন্যেই কাঠ বা কয়লা পোড়ালে আমরা উত্তাপ পাই।

এক কিলোগ্রাম জলকে ১৪'৫ থেকে ১৫'৫ ডিগ্রীতে উত্তপ্ত করতে যে

পরিমাণ উত্তাপ-শক্তির প্রয়োজন হয়, বৈজ্ঞানিকেরা তাকে ছোট ক্যালরি বলেছেন। ১ গ্র্যাম হীরা পুড়িয়ে ৭৮০, এক গ্র্যাম গ্র্যাফাইট পুড়িয়ে ৭৮৫৫ ও এক গ্র্যাম কয়লার কার্বন (অঙ্গার) পুড়িয়ে ৮১৪০ গ্র্যাম ক্যালরি উত্তাপ-শক্তি পাই। এক হাজার গ্র্যাম ক্যালরিকে এক কিলো ক্যালরি বলা হয়। এক গ্র্যাম অ্যাটম (Gram atom) অর্থাৎ ১২ গ্র্যাম অঙ্গার পুড়িয়ে ৯৭·৬ কিলো ক্যালরি উত্তাপ-শক্তি পেতে পারি। 'পোড়া' কথাটি চলিত হলেও অবৈজ্ঞানিক কথা। রসায়নবিদেরা কোন জিনিসের সঙ্গে অক্সিজেনের রাসায়নিক সংযোগকে 'পোড়া' বলেন, ইংরেজিতে একে অক্সিডেশন বলা হয়। অঙ্গার বা কার্বনের সঙ্গে অক্সিজেনের পূর্ণভাবে রাসায়নিক সংযোগ হলে, অর্থাৎ কয়লার সবটা কার্বন ডাইঅক্সাইডে পরিণত হলে আমরা উপরিউক্ত ৯৭·৬ বড় ক্যালরি উত্তাপ-শক্তি পেতে পারি। কিন্তু অঙ্গার অর্থাৎ কার্বন ও অক্সিজেনের রাসায়নিক সংযোগে কার্বন মনোক্সাইডও তৈরি হয়। কার্বন মনোক্সাইড হলে আমরা মাত্র ২৯·৬ বড় ক্যালরি উত্তাপ-শক্তি পাই। বৈজ্ঞানিকেরা দেখেছেন যে, ৫৫০ ডিগ্রী উত্তাপে কার্বন ও অক্সিজেনের রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে ৮৯·৩ ভাগ কার্বন ডাইঅক্সাইড ও ১০·৭ ভাগ মনোক্সাইড গ্যাস তৈরি হয়। ৬৫০ ডিগ্রীতে ৬১ ভাগ ডাইঅক্সাইড ও ৩৯ ভাগ মনোক্সাইড এবং ৮০০ ডিগ্রীতে ৭ ভাগ ডাইঅক্সাইড ও ৯৩ ভাগ মনোক্সাইড গ্যাস তৈরি হয়। ফার্নেসে অর্থাৎ বিজ্ঞানসম্মত চুল্লীতে কার্বন, কার্বন মনোক্সাইড ও কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং কয়লার অঙ্গীভূত জলীয় অংশ—এগুলির পরস্পরের মধ্যে নানারূপ রাসায়নিক প্রক্রিয়া ঘটবার ফলে কখনও উত্তাপ-শক্তি নির্গত হয়, কখনও বা উত্তাপ-শক্তি সরবরাহের প্রয়োজন হয়। এই সব রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মোট হিসাব-নিকাশ করে যেটুকু শক্তি যোগের ঘরে জমা হয়, কয়লা পুড়িয়ে আমরা সেই উত্তাপ-শক্তি পাই।

এক পাউণ্ড জলকে ১ ডিগ্রী বেশি গরম করতে হলে যে উত্তাপ-শক্তির প্রয়োজন হয়, তাকে সেন্টিগ্রেড হিট ইউনিট (Centigrade Heat Unit) বা সি. এইচ. ইউ. (C. H. U.) নাম দেওয়া হয়েছে। এটি ৪৫৩ গ্র্যাম ক্যালরির সমান। এছাড়া আর একটি ইউনিট আছে, যাকে ব্রিটিশ থার্ম্যাল ইউনিট বা বি. টি. ইউ. বলা হয়। ১ সি. এইচ. ইউ. ১·৮ বৃটিশ থার্ম্যাল ইউনিটের সমান, অথবা ২৫২ গ্র্যাম ক্যালরির সমান।

বৈদ্যুতিক শক্তির ইউনিটকে আমরা কিলোওয়াট আওয়ার্স (Kilowatt Hours) বা কে. ডাব্‌লু. এইচ. (K. W. H.) বলি।

কয়লার উত্তাপ-শক্তিকে যে বৈদ্যুতিক শক্তিতে পরিণত করা যায়, তা সকলেই জানেন। ১ কে. ডাব্‌লু. এইচ. ৩৪১২'৮ বি. টি. ইউ.-এর সমান। বি. টি. ইউ.-কে ০'০০০২৯৩ দিয়ে গুণ করলে কে. ডাব্‌লু. এইচ. পাওয়া যায়।

উত্তাপ-শক্তিকে (ক্যালরি) মেকানিক্যাল শক্তি অর্থাৎ যান্ত্রিক শক্তিতে পরিণত করা যায়। ১ ক্যালরি ৪২৭ এম. কে. জি.-এর সমান, অর্থাৎ ১ ক্যালরি উত্তাপ-শক্তির দ্বারা ৪২৭ কিলোগ্রাম ওজনের কোন দ্রব্যকে ১ মিটার উত্তোলন করা যায়। এছাড়া উত্তাপ-শক্তি কোন উত্তপ্ত বস্তু থেকে ঠাণ্ডা বস্তুতে যাবার সময় আংশিকভাবে যান্ত্রিক শক্তিতে পরিণত হয়। যন্ত্র থেকে কাজ নেবার জন্যে যে শক্তির প্রয়োজন হয়, তাকেই আমরা যান্ত্রিক শক্তি বলি। কয়লার উত্তাপকেও যান্ত্রিক শক্তিতে পরিণত করা যায়। বয়লারে কয়লা ব্যবহার করে আমরা বাষ্প-শক্তি পাই। সেই শক্তি পরে বৈদ্যুতিক শক্তিতে পরিণত হয়, তাই কয়লার এত আদর সেখানে।

গণ্ডোয়ানার ১ পাউণ্ড কয়লা থেকে প্রায় ১২০০০ বি. টি. ইউ. উত্তাপ-শক্তি পাওয়া যেতে পারে। এই উত্তাপ-শক্তিকে বৈদ্যুতিক শক্তিতে পরিণত করা যেতে পারে। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, এক পাউণ্ড কয়লা থেকে ৪ কে. ডাব্‌লু. এইচ. বৈদ্যুতিক শক্তি পাওয়া যায়। এই হিসাবে ১ টন কয়লা থেকে ২৭ মিলিয়ন বি. টি. ইউ. পাওয়া যেতে পারে। অতএব প্রায় ২'৫ টন কয়লা থেকে প্রায় ২ কিলোওয়াট বর্ষ (Kilowatt years) বৈদ্যুতিক শক্তি পাওয়া যায়, যা ৩ হর্স পাওয়ার বা অশ্ব-শক্তির সমান।

কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ২'৫ টন কয়লা থেকে এই শক্তি পাওয়া যায় না; তার কারণ কয়লার অন্তর্নিহিত উত্তাপ প্রথমে যান্ত্রিক শক্তিতে পরিণত হয়, পরে তা বৈদ্যুতিক শক্তিতে পরিবর্তিত হয়। তাছাড়া বয়লার মাত্র শতকরা ১৫ ভাগ শক্তিকে বৈদ্যুতিক শক্তিতে পরিণত করতে পারে। অতএব এক কিলোওয়াট বর্ষ (Kilowatt year) শক্তি পেতে প্রায় ৮'৩৪ টন কয়লার প্রয়োজন হয়। কয়লার দাম ধরে হিসাব করে দেখা গেছে যে, ইউনিট বৈদ্যুতিক শক্তি পেতে মাত্র ১'৪ পাই খরচ লাগে, যদি কয়লার প্রতি টনের দাম ২'৫ রূপীজ ধরা যায়। কয়লার দাম বেশি হলে সেই অনুপাতে বৈদ্যুতিক

ইউনিটের দাম বেড়ে যায়। কয়লার উত্তাপ-শক্তির পরিমাণ কম হলেও বৈদ্যুতিক ইউনিটের দাম বেড়ে যায়।

আগে বলা হয়েছে যে, বয়লার কয়লার শতকরা ১৫ ভাগ উত্তাপ-শক্তিকে অন্য শক্তিতে পরিণত করতে পারে। ক্রুসিবল ফারনেস, রিভারবারেটরি ফারনেস, ষ্টিল ফারনেস, কুপোলা প্রভৃতি শতকরা ১০ থেকে ৫০ ভাগ শক্তি নিতে পারে।

কোল গ্যাস বা কয়লা গ্যাস

১৭৯২ সালে মারডক (Murdock) যে কর্ণওয়াল সহরে কোল গ্যাস দিয়ে নিজের বাড়ী আলোকিত করেন, সে কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। ১৮২৩ সালের মধ্যে ইংল্যাণ্ডের ৫২টি সহরকে কোল গ্যাসের আলোকে আলোকিত করা হয়। ১৮২৫ সালে ড্রেস্‌ডেনে, ১৮৩৮ সালে লাইপজিগে এবং ১৮৪৭ সালে বার্লিনে গ্যাসের কারখানা খোলা হয়। ১৮১৯ সালে প্যারিসে গ্যাসের কারখানার পত্তন হয়।

গ্যাস তৈরির জন্যে যে কয়লা ব্যবহার করা হয়, তাকে গ্যাস কয়লা বলে। এগুলি পোড়ালে যথেষ্ট গ্যাস পাওয়া যায়। এই কয়লা পোড়ালে একদিকে যেমন গ্যাস পাওয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে তেমনি কিছু কোক ও বেশ খানিকটা আলকাত্‌রাও পাওয়া যায়। এই কয়লাগুলিতে সাধারণত ৩০-৪০ ভাগ উদ্বায়ী পদার্থ (Volatile matter), ৬০-৬৮ ভাগ স্থায়ী কার্বন (Fixed carbon), ১০-১১ ভাগ ছাই ও এক থেকে দেড় ভাগ জলীয় পদার্থ থাকে এবং এথেকে ১৩০০০ বি. টি. ইউ. উত্তাপ-শক্তি পাওয়া যায়। এগুলি সাধারণত অন্য কয়লা থেকে বয়সে কম।

গ্যাস তৈরির জন্যে ফায়ার ক্লে (Fire clay) দিয়ে তৈরি ইটের রিটর্ট (Retort) নামক এক প্রকার ভাটার ব্যবহার হয়। ৫-১০টি ভাটা এক সঙ্গে তৈরি করা হয়। এই ভাটাগুলি পরস্পরের মধ্যে উত্তাপ দেবার জন্যে ফ্লু (Flue) আছে। এগুলি হরাইজণ্ট্যাল রিটর্ট। এক একটি ভাটা ২০ ফুট × ২২ ইঞ্চি × ১৬ ইঞ্চি প্রশস্ত। সাধারণত প্রত্যেক সারিতে দুটি করে ৪ সারিতে ৮টি ভাটায় একটি ইউনিট হয়। ভাটাগুলির মুখে একটি করে পাইপ থাকে। ভাটা থেকে উত্থিত গ্যাস ঐ পাইপের মধ্য দিয়ে প্রধান নলে (Hydraulic main)

এসে উপস্থিত হয়। ভাটাগুলি প্রোডিউসার গ্যাস (Producer gas) জ্বালিয়ে উত্তপ্ত করা হয়। প্রোডিউসার গ্যাস ভাটাগুলির নীচে অবস্থিত। ভাটার ফ্লুগুলিতে প্রোডিউসার গ্যাস জ্বালাবার ফলে ভাটাগুলি ১২৫০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে উত্তপ্ত হয়। ভাটাগুলিকে এক সঙ্গে জ্বালানো হয় না, একটি একটি করে জ্বালানো হয়। এক্ষেত্রে কার্বনাইজেসন প্রক্রিয়ার ফলে গ্যাস, কোক ও কিছু আলকাত্‌রা তৈরি হয়। এই প্রক্রিয়াটি শেষ হতে প্রায় ১০-১১ ঘণ্টা সময় লাগে। সাধারণত বিভিন্ন অবস্থায় উত্তপ্ত ভাটা থেকে গ্যাস সংগ্রহ করে মেশানো হয়। কন্‌ডেন্সার (Condenser) এবং ওয়াশিং যন্ত্রের ভিতর দিয়ে গ্যাসকে নিয়ে যাবার পূর্বে এই মিশ্রণ-কার্য সম্পন্ন হয়। এর পর গ্যাসকে আলকাত্‌রা, জলীয় অংশ এবং অন্যান্য উপজাত পদার্থ থেকে বিমুক্ত করা হয়। কিভাবে এটা সাধিত হয়, পরের অধ্যায়ে তার আলোচনা করা হবে। গ্যাস তৈরির জন্যে ভার্টিক্যাল এবং হরাইজণ্ট্যাল—দুই প্রকারের ভাটারই ব্যবহার হয়।

কোল গ্যাসের সঙ্গে সাধারণতঃ ব্লু গ্যাস (Blue gas) অথবা কারবুরেটেড ওয়াটার গ্যাস (Carburated water gas) অথবা প্রোডিউসার গ্যাস মেশানো হয়। বম্বে গ্যাস ওয়ার্কসে (Bombay Gas Works) ব্লু গ্যাস মেশানো হয়। কলকাতার ওরিয়েণ্ট্যাল গ্যাস কোম্পানী কোল গ্যাসের সঙ্গে অন্য কোন গ্যাস মেশায় না। কিন্তু সেখানে গ্যাসকে প্রথমত রোটারি স্ক্রুবার (Rotary Scrubber) নামক যন্ত্রে জল দিয়ে ধৌত করা হয়। এর পর সাইনাইড ওয়াসার (Cynide washer) নামক যন্ত্রে গ্যাসকে সাইনাইড অংশ থেকে বিমুক্ত করা হয় এবং পরিশেষে পেলোগ ও ওডোয়িন এক্সট্র্যাক্টর (Pelogue and Audouin Extractor) নামক যন্ত্রের সাহায্যে গ্যাসকে আলকাত্‌রা থেকে মুক্ত করা হয়। ১৯৪৯ সালে প্রায় ২০৪০ মিলিয়ন কিউবিক ফিট গ্যাসের দ্বারা আমাদের বড় বড় সহরের রাস্তা রাত্রে আলোকিত করবার জন্যে ব্যবহৃত হয়েছিল।

গ্যাস ভাটিতে যে কোক তৈরি হয়, তা লোহা তৈরির জন্যে উপযুক্ত নয়। এই কোক জনসাধারণের উনুনে ইন্ধন হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ১৯৪৮ সালে কলকাতায় যে পরিমাণ গ্যাস তৈরি করা হয়েছিল, তার শতকরা ৩৬ ভাগ ঔদ্যোগিক প্রতিষ্ঠানে, ৩৩ ভাগ জনসাধারণের উনুনে ইন্ধন হিসাবে, ২২ ভাগ

রাস্তা আলোকিত করবার উদ্দেশ্যে, ৬ ভাগ হাসপাতালে, ২ ভাগ জনসাধারণের গৃহ আলোকিত করবার জন্যে এবং ১ ভাগ স্কুল-কলেজের লেবরেটরিতে ব্যবহৃত হয়েছিল।

ইউরোপীয় গ্যাস কয়লা থেকে উৎপন্ন গ্যাসে যে পরিমাণ সালফ্রেটেড হাইড্রোজেন :(Sulphretted Hydrogen) পাওয়া যায়, সৌভাগ্যবশত আমাদের দেশের কয়লাতে সে পরিমাণ সালফ্রেটেড হাইড্রোজেন নেই। সালফ্রেটেড হাইড্রোজেন একটি দুর্গন্ধযুক্ত বিষাক্ত গ্যাস। এর গন্ধক অংশটি কোন কোন ধাতু নির্মিত পাত্রকে অল্প দিনের মধ্যেই রাসায়নিয় প্রক্রিয়ার নষ্ট করে দেয়।

এছাড়া আমাদের দেশের গ্যাস কয়লা উত্তাপ পেলে ফুটে ওঠে। এজন্যে ভার্টিক্যাল রিটর্টে (Vertical Retort) এথেকে গ্যাস তৈরি করা সম্ভব নয়।

আর একটা অসুবিধার কথা এই যে, আমাদের গ্যাস কয়লায় ছাই অনেক খানি প্রায় ইউরোপীয় কয়লার ছাইয়ের দ্বিগুণ। তাছাড়া আমাদের গ্যাস কয়লার ছাই সহজেই গলে গিয়ে ক্লিংকার (Clinker) অর্থাৎ ঝামার ন্যায় এক প্রকার পদার্থের সৃষ্টি করে। সে জন্যে বিশেষ প্রকার ঝাঁজরি বা গ্রেটের (Grate) ব্যবহার করতে হয়। বরাকর বা রাণীগঞ্জের কয়লাই গ্যাস তৈরির জন্যে উপযুক্ত।

গ্যাস কয়লাকে রিটর্টের (Retort) ভিতর পোড়ালে ১৫০-২০০ ডিগ্রিতে প্যারাফিন হাইড্রোকার্বন বেরিয়ে আসে। ৪০০ ডিগ্রীতে সালফার সংযুক্ত যৌগিক পদার্থ ও কিছু তেল জাতীয় পদার্থ পাওয়া যায়। এই সময় অনেক গ্যসও তৈরি হয়। এই গ্যাসের প্রধান উপাদান হাইড্রোকার্বন জাতীয় পদার্থ। এই হাইড্রোকার্বন সংযুক্ত গ্যাস, বেঞ্জিন (Benzene), টলুয়েন (Toluene) প্রভৃতি পদার্থের সঙ্গে মিলে আলকাতরা সৃষ্টি করে। ১০০০ ডিগ্রিতে শুধু হাইড্রোজেনই বেরোয়। হাইড্রোজেনের সঙ্গে কয়লার নাইট্রোজেন মিশে অ্যামোনিয়া (Ammonia) সৃষ্টি করে।

১৯৪৭, ১৯৪৮ ও ১৯৪৯ সালে ভারতে প্রায় ২০০০ মিলিয়ন কিউবিক ফিট গ্যাস তৈরি হয়েছিল। ১৯৬৪ সালে এর পরিমাণ নিশ্চয়ই বেড়ে গেছে!

কার্বনাইজেসন (Carbonisation)

কার্বনাইজেসন কথাটা এই অধ্যায়ে আমরা বারংবার ব্যবহার করবো। কাজেই একথা বলতে আমরা কি বুঝি, তা স্পষ্ট করে বলা দরকার। এই কথাটির গূঢ় তত্ত্ব কি, তা আমাদের জানা দরকার। কিন্তু একে সম্যকভাবে বোঝাবার জন্যে কিছু অবান্তর হলেও অপ্রাসঙ্গিক নয়, এমন কথার আলোচনা করতে হবে। রাসায়নিকেরা কয়লাকে বিশ্লেষণ করে দেখেছেন যে, কয়লাতে হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, ফস্‌ফরাস ও গন্ধক বর্তমান আছে। কিন্তু এই পদার্থগুলি স্বাধীন অবস্থায় বর্তমান থাকে না, কার্বনের সঙ্গে রাসায়নিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়ে যৌগিক পদার্থ হিসাবেই কয়লার শরীরে বর্তমান থাকে। এইগুলির মধ্যে কার্বনের অংশই সবচেয়ে বেশি। কয়লাকে বেঞ্জিন (Benzene) বা ইথাইল অ্যাসিটেট বা পেট্রোল ইথার (Petroleum eather) বা ইথাইল অ্যালকোহল (Ethyl alcohol) দ্বারা সাধারণ বায়ুর চাপ থেকে অনেক অধিক চাপে ২৫০ ডিগ্রীতে কয়লার অন্তর্নিহিত যৌগিক পদার্থের কিছু অংশ এই সমস্ত দ্রবণকারী পদার্থের সঙ্গে মিলিত হয়ে বেরিয়ে আসে। বেঞ্জিন ব্যবহার করলে প্যারাফিন সমন্বিত এক প্রকার তেল পাওয়া যায়। ইথাইল অ্যাসিটেট ব্যবহার করলে ঐরূপ তেল ছাড়া আর এক প্রকার রজন (Resin) জাতীয় পদার্থও পাওয়া যায়। ইথাইল অ্যালকোহল ব্যবহার করলে সোনালী রঙের এক প্রকার তেল পাওয়া যায়। Pictet, Wheeler, Bone, Franz, Fischer প্রভৃতি রাসায়নিকেরা বেঞ্জিন বা বেঞ্জোল (Benzene or Benzol) ব্যবহার করেও অনেক প্রকার যৌগিক পদার্থ কয়লার শরীর থেকে নিষ্কাশন করতে সক্ষম হয়েছেন। কয়লা-বিশেষজ্ঞ রাসায়নিকেরা বলেন যে, কয়লার শরীর দুই শ্রেণীর বিভিন্ন ধরনের যৌগিক পদার্থে গঠিত। প্রথম শ্রেণীতে এক প্রকার অতি উচ্চ স্তরের পলিমেরিজেসন (Polymerisation) পদার্থ থাকে, যার অধিকাংশ ভাগই কার্বনের দ্বারা গঠিত এবং যা মোটেই দ্রবণীয় নয় এবং যা অতি উচ্চতাপে কেবল হাইড্রোজেন অংশটিকে ছেড়ে দেয়। দ্বিতীয় শ্রেণীতে এমন সব পদার্থ থাকে, যা পলিমেরিজেসনের সর্বোচ্চ স্তরে পৌছায়নি এবং যা উত্তপ্ত হলে আলকাত্‌রায় রূপান্তরিত হয় এবং যা কোল গ্যাসে হাইড্রোজেন অংশটি সরবরাহ করে। এই অংশ থেকে দ্রবণীয় পদার্থগুলিও বের হয়ে আসে। কয়লাকে উচ্চ তাপে উত্তপ্ত করলে উপরিউক্ত প্রথম শ্রেণীর

পদার্থ থেকে কার্বন অংশটি অন্যান্য মৌলিক পদার্থ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোকের কাঠামোর বিভিন্ন অংশগুলি তৈরি করে এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর পদার্থ থেকে কাঠামোর বিভিন্ন অংশগুলিকে একত্রিত করে জুড়ে দেবার উপযুক্ত মশলা অর্থাৎ একপ্রকার সিমেন্টিং (Cementing) পদার্থ সরবরাহ করে।

কয়লাকে সামান্য উত্তপ্ত করলে কয়লার অঙ্গীভূত যৌগিক পদার্থগুলি হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, গন্ধক ও ফস্‌ফরাস প্রভৃতি মৌলিক পদার্থগুলিকে ছেড়ে দেয়, তখন এই মৌলিক পদার্থগুলি আবার পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে অন্য ধরনের যৌগিক পদার্থের রূপ ধারণ করে বেরিয়ে আসে। সে জন্যে কয়লাকে উত্তপ্ত করলে আমরা জল, অ্যামোনিয়া, কার্বন ডাইঅক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড, হাইড্রোজেন সালফাইড পাই। তাছাড়া মিথেন, ইথেন প্রভৃতি প্যারাফিন হাইড্রোকার্বনগুলিকেও পাওয়া যায়। কয়লাকে ১০০ ডিগ্রীতে উত্তপ্ত করলে আমরা কার্বন ডাইঅক্সাইড ও কিছু প্যারাফিন হাইড্রোকার্বন পাই। ২০০ ডিগ্রীতে উল্লিখিত পদার্থ ছাড়াও কিছু বুটেন (Butane) ও জল পাই। ২৭০ ডিগ্রীতে এছাড়াও কার্বন মনোক্সাইড, হাইড্রোজেন সালফাইড, কিছু হাইড্রোজেন এবং অসম্পৃক্ত (Unsaturated) হাইড্রোকার্বন পাই। ৩১০ ডিগ্রী উত্তাপে কয়লা থেকে আলকাতরা বেরিয়ে আসে। ৩৫০ ডিগ্রী উত্তাপে কয়লা নাইট্রোজেন ছাড়া পায় এবং হাইড্রোজেনের সঙ্গে মিশে অ্যামোনিয়ায় পরিণত হয়ে দেখা দেয়।

কার্বনাইজেসন কথাটি আমরা কি উদ্দেশ্যে ব্যবহার করি, তা এখন বোঝা কঠিন হবে না। কার্বনাইজেসন বলতে আমরা এমন একটি রাসায়নিক প্রক্রিয়া বুঝি, যার ফলে কয়লার শরীর থেকে উপরিউক্ত নানাপ্রকারের গ্যাসীয় অংশ, আলকাতরা ও জল বেরিয়ে যাওয়ায় খাঁটি কার্বন সৃষ্টি হয়ে সিমেন্টিং পদার্থের সাহায্যে কোক তৈরি করতে সক্ষম হয়।

কার্বনাইজেসন কথাটির পরিবর্তে অঙ্গারীকরণ কথাটা ব্যবহার করা যেতে পারে, কিন্তু অঙ্গারীকরণ কথাটার অন্য অর্থ করা যায় বলে আমরা কার্বনাইজেসন কথাটিই ব্যবহার করবো।

হাই-টেম্পারেচার কার্বনাইজেসন

বায়ু সরবরাহ না করে কয়লাকে কোন বদ্ধ চুল্লীতে উত্তাপ দিলে কয়লার অন্তর্নিহিত উদ্বায়ী পদার্থগুলি গ্যাসের আকারে নির্গত হয়, একথা আগেই বলা হয়েছে। এই প্রক্রিয়াকে ডেস্ট্রাকৃটিভ ডিষ্টিলেশন (Destructive distillation) বা অন্তর্ধূম পাতন বলা হয়। কারণ কয়লা এই প্রক্রিয়ার প্রভাবে ধ্বংস হয়ে রূপান্তর গ্রহণ করে। এই প্রক্রিয়ার ফলে কোকিং কয়লার ছোট ছোট চূর্ণিত অংশগুলি গলে জমাট বেঁধে গিয়ে একটা কঠিন পদার্থে রূপান্তরিত হয়। কয়লার এই নবকলেবরকে আমরা কোক (Coke) নাম দিয়েছি। কয়লার অঙ্গার অংশগুলি জমাট বেঁধে গিয়েই এই নবকলেবর গ্রহণ করে। কয়লাকে বদ্ধ চুল্লীতে বায়ু সরবরাহ না করে ৪০০-৫৫০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে উত্তপ্ত করাকে বৈজ্ঞানিকেরা লো-টেম্পারেচার কার্বনাইজেসন নাম দিয়েছেন এবং ৯০০ থেকে ১০০০ ডিগ্রীতে উত্তপ্ত করাকে হাই-টেম্পারেচার কার্বনাইজেসন বলেন। আমরা প্রথমে হাই-টেম্পারেচার কার্বনাইজেসনের কথাই বলবো। নন্‌-কোকিং (Non-coking) কয়লা নিয়ে এই প্রক্রিয়া সাধন করলে কোক পাওয়া যায় না। তাই এর জন্যে কোকিং কয়লার ব্যবহার হয়। কোকিং কয়লা থেকে যে কোক পাওয়া যায়, তা অঙ্গারবহুল এবং ঝামার ন্যায় ফোঁপড়া। কোকের রন্ধ্রগুলি দহন-কার্যে সহায়তা করে এবং কোক সহজে চূর্ণ হয় না বলে লোহা পাথর গলাবার সময় ব্লাস্ট ফার্নেসে (Blast Furnace) ব্যবহারের পক্ষে এগুলি উপযুক্ত উপাদান।

মেটালার্জিক্যাল অর্থাৎ ধাতু সম্পর্কিত প্রক্রিয়ার জন্যে সাধারণত বিটুমিনাস কয়লা থেকে তৈরি কোকের ব্যবহার হয়। কোক তৈরি করতে সক্ষম এমন কয়লাকে কোকিং কয়লা বলা হয়। এই জাতীয় কয়লা থেকে দু'প্রকারের কোক পাওয়া যায়। যে সব কয়লাতে শতকরা ২৬-৩২ ভাগ উদ্বায়ী পদার্থ, ৬৮-৭৪ ভাগ অঙ্গার ও ৪-১০ ভাগ অক্সিজেন থাকে, সেগুলিকে কার্বনাইজ করলে আমরা বেশ শক্ত কোক (Hard coke) পাই। যে সব কয়লার শতকরা ১৮-২৬ ভাগ উদ্বায়ী পদার্থ, ৭৪-৮২ ভাগ অঙ্গার এবং ৪-৬ ভাগ অক্সিজেন থাকে এবং জ্বালালে খর্বাকৃতি শিখা দেয়, সেগুলিকে কার্বনাইজ করলে আমরা এক প্রকার ঠাসা কোক পাই। এই দুই প্রকারের কোকই মেটালার্জিক্যাল কোক। যে সব কয়লার শতকরা ১৭ ভাগের কম উদ্বায়ী

পদার্থ ও ৫ ভাগের বেশী জলীয় অংশ থাকে বা যে কয়লার শতকরা ৪০ ভাগের বেশী উদ্বায়ী পদার্থ থাকে, তারা উচ্চ তাপের কোক দেয় না। লিগ্‌নাইট, স্টিম কোল ও অ্যান্‌থ্রাসাইট কয়লা থেকে আমরা কোন প্রকার কোক পাই না। সে জন্যে এগুলিকে নন্‌কোকিং (Non coking) কয়লা বলা হয়। কয়লার ক্ল্যারেন ও ভিট্রেন অংশগুলি উচ্চ ধরনের কোক দেয় এবং কার্বনাইজ করলে এই অংশগুলি ফুলে ওঠে। ডুরেন ও ফিউজেন সাধারণত কোক তৈরি করে না, এদের সমষ্টিকরণ শক্তি (Agglomerating Power) নেই এবং এরা ফুলে ওঠে না। সাধারণত যে কোকিং কয়লায় অধিক পরিমাণে ডুরেন থাকে তারা ভাল কোক দেয় না ; কিন্তু ঝরিয়ার কয়লায় ডুরেনের সঙ্গে ক্ল্যারেন থাকবার ফলে সেগুলি উচ্চাঙ্গের কোক তৈরি করে। কার্বনাইজেসনের ফলে আপনার কায়া বিস্ফারিত না করেও কতকগুলি কয়লা বেশ ঠাসা কোক তৈরি করে। এরূপ কোকও ব্লাস্ট ফার্নেসে ব্যবহৃত হতে পারে, বিশেষত যে ক্ষেত্রে কোকের চাপ-সহনশক্তির প্রয়োজন থাকে। গিরিডি, ঝরিয়া ও রাণীগঞ্জের বরাকর শ্রেণীর (Series) কয়লা থেকে আমরা এরূপ কোক পাই। আসামের কয়লা থেকে আমরা মধ্যম শ্রেণীর কোক পাই, কিন্তু ঐ কোকে গন্ধকের অংশ বহুল পরিমাণে বর্তমান থাকে বলে মেটালার্জিক্যাল কাজে এর ব্যবহার হয় না।

কয়লাকে কোকে পরিণত করবার সময় কয়লার যে অংশটা চুল্লীর দেয়ালের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে, তা ১০০০ ডিগ্রী উত্তাপে গলে গিয়ে নরম হয়ে যায়। উত্তাপ বৃদ্ধির ফলে কোককরণ প্রক্রিয়া অগ্রসর হতে থাকে বলে ঐ নরম গলিত অংশটা চুল্লীর মধ্যদেশে অবস্থিত কয়লাচূর্ণের দিকে অগ্রসর হয় এবং গরম গ্যাসীয় অংশগুলি দেয়ালের দিকে অগ্রসর হয়ে অত্যন্ত উত্তপ্ত হবার ফলে গ্র্যাফাইটে পরিণত হয়। কোক ওভেন বা ভাটার মধ্যদেশে অবস্থিত কয়লা-চূর্ণগুলি প্রথমত গলে যায়, পরে তা থেকে উদ্বায়ী পদার্থগুলি নির্গত হয়ে গেলে সেটা সমষ্টিকরণ প্রক্রিয়ার সাহায্যে কোকে পরিণত হয়।

হাই-টেম্পারেচার কার্বনাইজেসনের ফলে ৯০০-১২০০ ডিগ্রী উত্তাপে আমরা প্রতি টন কয়লা থেকে নিম্নলিখিত পরিমাণ কোক, আলকাতরা, গ্যাস ও লাইট অয়েল পাই—

হার্ড কোক	...	০·৭২৫ টন
গ্যাস	...	১৩০০০ কিউবিক ফিট

আলকাত্‌রা	...	৫-১০ গ্যালন
লাইট অয়েল	...	২ গ্যালন

কার্বনাইজেসন প্রক্রিয়ার প্রধান উদ্বায়ী অংশ কোক এবং এই কোকই যে লোহা গলাবার কাজে একমাত্র উপযুক্ত সহায়ক, সে কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। কার্বনাইজেসন প্রক্রিয়ার ফলে কোক ছাড়া কোল গ্যাস এবং আলকাত্‌রাও পাওয়া যায়। এই কোল গ্যাস ও আলকাত্‌রার মধ্যে বহু মূল্যবান পদার্থ পাওয়া যায়। গ্যাস তৈরির সময় গ্যাসকেই মুখ্য এবং কোক ও আলকাত্‌রাকে উপজাত মনে করা হয়; কিন্তু কার্বনাইজেসনের বেলায় কোককে মুখ্য এবং গ্যাস ও আলকাত্‌রাকে উপজাত মনে করা হয়। কার্বনাইজেসনের মাধ্যমে কোক তৈরি করবার জন্যে নানারূপ চুল্লীর (Ovens) ব্যবহার প্রচলিত আছে।

মৌচাকের মত এক ধরণের চুল্লী আছে। তাকে মৌচাক চুল্লী (Beehive ovens) বলে। ১৬২০ সালে সার উইলিয়াম সেণ্ট জনকে মৌচাক চুল্লীর পেটেণ্ট দেওয়া হয়। অধিক উত্তাপে কার্বনাইজেসন করতে হলে চুল্লীর ইটগুলিও উচ্চ তাপসহ হওয়া চাই। কয়লাকে কোকে পরিণত করতে প্রায় ১০০০ ডিগ্রী উত্তাপের প্রয়োজন হয়; কাজেই চুল্লীর দেয়ালের ইটগুলি এর চেয়েও উচ্চ তাপসহ হওয়া দরকার। একমাত্র সেরামিক রিফ্র্যাক্টরি (Ceramic Refractory) ইটই এই উচ্চ তাপ সহ্য করতে সক্ষম। চুল্লীগুলিকে উত্তপ্ত করবার জন্যে যে মিশ্রিত গ্যাস ব্যবহার করা হয়, তার উত্তাপ-শক্তি যাতে এই ইটগুলি ভেদ করে চুল্লী-গর্ভস্থ কয়লাকে উত্তপ্ত করতে পারে, তার ব্যবস্থা থাকা চাই। কাজেই ইটগুলি কেবল উত্তাপসহ হলেই যথেষ্ট নয়, উত্তাপ পরিচালনশীলও হওয়া চাই। একমাত্র ৯২ ভাগ সিলিকা সমন্বিত সিলিকার ইটই (Silica bricks) এই দুরূহ কর্তব্য পালনে সক্ষম। তাই এই ধরনের চুল্লীর জন্যে সিলিকা ইটের ব্যবহার হয়।

মৌচাক চুল্লীগুলি বাংলা দেশের পোয়ানের মত। একটা খাদের (Trench) উপর গায়ে গা লাগিয়ে সারি সারি সজ্জিত চুল্লীগুলি একত্রে থাকলে তাকে একটি ব্যাটারী (Battery) বলা হয়। আমাদের দেশে ২৫টি কোলিয়ারীতে এই ধরণের চুল্লীর ব্যবহার হয়। এদের মধ্যে মারিনে কুজামা, নিউ মারিলেন, ঈষ্ট ভাগতদিহি ও ধন্সার কোলিয়ারীর নামই উল্লেখযোগ্য। ১৯৪৮ সালে

ভারতে সর্বসমেত ২·৫৯ মিলিয়ন টন কয়লা কার্বনাইজ করা হয়। তার মধ্যে ০·২১ মিলিয়ন টন কার্বনাইজ করা হয় মৌচাক চুল্লীর মাধ্যমে। ইটের তৈরি এই ১২ ফুট ডায়ামেটারের চুল্লীগুলি ৮ ফুট উঁচু। কয়লা ভরবার জন্যে এদের মাথার উপরে একটি করে গর্ত থাকে। এই গর্তের মধ্যে প্রায় ৩ ফুট উঁচু কয়লা দিয়ে এক একটি চুল্লীর গর্ত ভর্তি করে দেওয়া হয়। পূর্ববর্তী কার্বনাই-জেসন প্রক্রিয়ার উত্তাপেই পরবর্তী প্রক্রিয়ায় কয়লাগুলি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। তার ফলে কয়লা থেকে সহজেই উদ্বায়ী পদার্থগুলি গ্যাস হয়ে বেরিয়ে আসে এবং বায়ুর সঙ্গে মিশ্রিত করে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। এরই নিম্নগামী উত্তাপ-শক্তিতে কয়লা কোকে পরিণত হয়। কিছুক্ষণ পরে বায়ুর সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া হয়। দু-তিন দিন সময়ে চুল্লীর মধ্যস্থিত কয়লা কোকে পরিণত হয়। কোকগুলিকে বের করে নিয়েই জল দিয়ে নিবিয়ে দেওয়া হয়। এতে যে ধরনের কোক তৈরি হয়, তা শক্ত এবং রূপার ন্যায় চক্‌চকে। এই প্রথায় কোক তৈরি করলে মূল্যবান উপজাত পদার্থগুলি নষ্ট হয়ে যায়।

মৌচাক চুল্লীতে কার্বনাইজেসন করলে কয়লা থেকে কোক ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় না। গ্যাস ও তার আনুষঙ্গিক উপজাত পদার্থগুলিকে ধোঁয়ার আকারে আকাশে ছেড়ে দেওয়া হয়। ১৮৩০ সালে জার্মেনীতে সর্বপ্রথম চৌকা চুল্লীর ব্যবহার হয়। সেমেট সলভের কোক চুল্লীর ব্যাটারী সর্বপ্রথম ১৮৯৩ সালে সাইরাকিউজায় (Syracusa N. Y.) স্থাপিত হয়। এর পর ক্রমে ক্রমে অটো হফম্যান, কপার্স, উইল পুট, সিমন কার্ভেস ব্যাটারীর চলন হয়।

সে জন্যে আজকাল মৌচাক চুল্লীর চলন অনেকটা কমে এসেছে। আজকাল সবাই জানে যে, কয়লাকে কোকে পরিণত করবার সময় বহু মূল্যবান উপজাত পদার্থ পাওয়া যায়। সেগুলি সংগ্রহ না করে বায়ুর সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া অজ্ঞতারই পরিচয় দেয়। এ-যুগে তাই উপজাত পদার্থ সংগ্রহকারী চুল্লীর প্রচলন হয়েছে। আধুনিক কোক ওভেনগুলি সবই এক ধরনের নয়। এদের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও প্রত্যেকেরই লক্ষ্য এক। সে লক্ষ্য হচ্ছে—লোহা পাথর গলাবার উপযুক্ত কোক উৎপাদন এবং তার সঙ্গে সঙ্গে উপজাত পদার্থগুলি সংগ্রহের ব্যবস্থা করা।

আধুনিক চুল্লীগুলির চারটি অংশ আছে ; যথা—

১। কোক তৈরির ঘর (Cooking Chamber)। ঐ ঘরেই কয়লার কার্বনাইজেসন প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয়।

২। উনুনের দেয়ালের ফ্লু অর্থাৎ গ্যাস দহনের উপযুক্ত নল। এগুলিতে কয়লা উত্তপ্ত করবার জন্যে গ্যাস দহন করে কোক তৈরির প্রয়োজনীয় উত্তাপ সরবরাহ করা হয়।

৩। রিজেনারেটর্স (Regenerators)। এগুলি রিফ্র্যাক্টরি ইট দিয়ে ভর্তি ঘর। এই সব ঘরে বায়ু ও কম উত্তাপ-শক্তি সমন্বিত গ্যাসকে অধিকতর উত্তপ্ত করা হয়। গ্যাস দহনের ফল স্বরূপ যে অকেজো গ্যাস তৈরি হয়, তার উত্তাপ দিয়েই রিজেনারেটরে বায়ু মিশ্রিত গ্যাসকে উত্তপ্ত করা হয়।

৪। কোক তৈরির ঘর থেকে উপজাত গ্যাস বইবার নল, যাকে ইংরেজীতে Stand pipe বলে। এই নলের মাধ্যমেই গ্যাস ও অন্যান্য উপজাত পদার্থগুলি উপজাত পদার্থবাহী প্রধান নলে (Collecting main) উপস্থিত হয়।

কার্বনাইজেসনের জন্যে সারবন্দিভাবে এরূপ অনেকগুলি চুল্লী একত্রে ব্যবহৃত হয়। একে কোক ওভেন্স ব্যাটারী (Battery) বলা হয়। ১০ থেকে ১০০টি চুল্লী নিয়ে এক একটি ব্যাটারী হয়। ব্যাটারীতে পাশাপাশি দুটি চুল্লীর মাঝখানে ফ্লু থাকে। কোক তৈরির ঘরগুলি প্রায় ৪০ ফুট লম্বা ও ১৭ ইঞ্চি চওড়া। কিন্তু চওড়াটা আগাগোড়া ১৭ ইঞ্চি নয়। কোক তৈরি হলে যে দিক থেকে কোক ঠেলে বের করে দেওয়া হয়, সেদিকটা ১৭ ইঞ্চি ; কিন্তু যে দিকটা দিয়ে কোক বেরিয়ে আসে, সে দিকটা ৩ ইঞ্চি ছোট অর্থাৎ মাত্র ১৪ ইঞ্চি। উনুনগুলি প্রায় ১৩ ফুট উঁচু।

কার্বনাইজেসন প্রক্রিয়াটি সর্বাঙ্গসুন্দরভাবে নিষ্পন্ন করতে হলে এমন ভাবে উত্তাপ দিতে হয়, যাতে চুল্লীর সর্বত্র কয়লাগুলি একই সময়ে কার্বনাইজ্‌ড্‌ হতে পারে। অতএব উনুনের যে দিকটা বেশী চওড়া, সে দিকটায় বেশী উত্তাপ দেওয়া দরকার। প্রত্যেক ফ্লুতে যে গ্যাস পোড়ানো হয় তার ফলে পাশাপাশি দুটি চুল্লীর দুটি দেয়াল উত্তপ্ত হয়। ফ্লুর ভিতর মিশ্রিত গ্যাস ও বায়ু প্রায় কুড়ি মিনিট ধরে পুড়তে থাকে। এই মিশ্রিত

গ্যাস দহনের ফলে যে সব অকেজো গ্যাস তৈরি হয়, তা উপর দিকে উঠে পার্শ্ববর্তী ফ্লুর উপরিভাগ দিয়ে নীচের দিকে নেমে এসে রিজেনারেটরে গিয়ে উপস্থিত হয় এবং সেখান থেকে উত্তাপ ছেড়ে দিয়ে চুল্লীর চিম্‌নি দিয়ে বেরিয়ে যায়। এর পরের কুড়ি মিনিট উল্টো দিকে গ্যাস সরবরাহ করা হয়। এতক্ষণ পর্যন্ত যে ফ্লুগুলি পোড়া গ্যাস বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, এখন তাদের নীচের দিক থেকে দহনশীল বায়ু মিশ্রিত গ্যাসটাকে সরবরাহ করা হয়। এবারে এরা এই ফ্লুগুলিতে পোড়ে এবং পোড়া গ্যাস এবারে এদের মাথার দিকে থেকে উঠে প্রথম ফ্লুর মাথার দিক দিয়ে প্রবেশ করে আবার রিজেনারেটরে পৌছে উত্তাপ ছেড়ে দিয়ে চিম্‌নি দিয়ে বাইরে চলে যায়।

উপরে যে রিফ্র্যাক্টরি ইটগুলির কথা বলা হয়েছে, উত্তপ্ত হলে তাদের আয়তন বাড়ে এবং ঠাণ্ডা হলে কমে যায়। একথা জেনে রাখা ভাল, কারণ তাহলে সহজে বোঝা যায় যে, চুল্লীগুলি একবার গরম হলে সেগুলিকে আর ঠাণ্ডা হতে না দিয়ে তাতেই ক্রমাগত কার্বনাইজেসন প্রক্রিয়া চালানো হয় কেন। ইটগুলি গরম থেকে ঠাণ্ডা হবার সময় আয়তনে ছোট হবার ফলে চুল্লীর দেয়ালগুলি এখানে-ওখানে ফেটে যায়। এইরূপ ফাটলগুলি গ্যাস বেরিয়ে যাবার রাস্তার কাজ করে। এভাবে গ্যাস বেরিয়ে যেতে সুরু করলে কার্বনাইজেসন-প্রক্রিয়াটি সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হয় না।

ফ্লু বা গ্যাস দহন-নালীর কথা উপরে বলা হয়েছে। এদের বিষয় এটুকু জেনে রাখা ভাল যে, সাধারণত পাশাপাশি দুটি চুল্লীর মধ্যবর্তী দেয়ালের প্রত্যেকটিতে ২৮টি উর্ধ্বগামী ফ্লু থাকে। এরা চুল্লীর দেয়ালের গা থেকে মাথা পর্যন্ত লম্বা। পাশাপাশি ৩টি চুল্লীর মধ্যস্থিত চুল্লীর দু-পাশের দেয়ালে অবস্থিত ফ্লুগুলি ঐ দেয়াল দুটিকে উত্তপ্ত করে। অবশ্য একটা ব্যাটারীর প্রথম ও শেষ চুল্লীর বেলায় যে একথা খাটে না, তা বোধ হয় বোঝাবার প্রয়োজন নেই।

এখন চুল্লীগুলির ছাদের কথা একটু বলা দরকার। প্রত্যেকটি চুল্লীর ছাদে তিন থেকে চারটি করে ১৪-১৬ ইঞ্চি ডায়মেটারের গর্ত (Holes) থাকে। এই বড় বড় গর্ত দিয়ে চুল্লীতে কয়লা ভর্তি করা হয়। কয়লা ভর্তি করা হয়ে গেলে এই গর্তগুলিকে ভারী গোল লোহার চাক্‌তি দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। তাছাড়া প্রত্যেক চুল্লীর ছাদে, চুল্লীর ভিতরকার অবস্থা দেখবার জন্যে একটি

ছোট গর্ত থাকে। এই গর্ত দিয়ে ইচ্ছামত চুল্লীর ভিতরকার গ্যাসের নমুনা (Sample) বের করে নেওয়া যায়। লোহার তৈরি ঢাক্না দিয়ে এই গর্তটাকেও ঢেকে রাখা হয়।

রান্না ঘরের ছাদে যেমন ধোঁয়া বের করে দেবার জন্যে চিম্‌নি লাগিয়ে দেওয়া হয়, তেমনি এই চুল্লীগুলির ছাদেও গ্যাস বের করে দেবার জন্যে চিম্‌নির মত নল প্রত্যেকটি চুল্লীর ছাদের একদিকে, কখনও বা হুদিকেও লাগানো থাকে। চিম্‌নির সঙ্গে এই নলগুলির তফাৎ এই যে, চিম্‌নির মুখ দিয়ে ধোঁয়া বেরিয়ে যায়, কিন্তু এই নলগুলির মুখ চিমনির মত খোলা নয় বলে গ্যাস বেরিয়ে যেতে পারে না। এই নলগুলিকে অ্যাসেনসন পাইপ (Ascention pipe) বলা হয়। এদেরই মাধ্যমে চুল্লীর গ্যাস ব্যাটারীর গ্যাস সংগ্রহকারী নলে (Collecting main) পৌছায়। অ্যাসেনসন পাইপগুলি ষ্টিলের তৈরি নল—এদের ভিতর দিকটায় রিফ্র্যাক্টরি পদার্থের লেপ দেওয়া থাকে। এই নলের ভিতরকার ডায়মেটার ১২-১৪ ইঞ্চি। এই নলেরও ঢাক্না থাকে এবং এগুলিকে ধৌত করবার জন্যে তরল পদার্থ বইবার উপযোগী ফোয়ারার বন্দোবস্ত আছে। এই ফোয়ারাগুলিকে ফ্লাস্ লিকার স্প্রে (Flush liquor spray) বলা হয়। অ্যাসেনসন পাইপটি যেখানে কলেক্টিং মেনে এসে মিলিত হয়, সেখানে একটি পাত্র (Cup) থাকে। এই কাপটি যখন ধৌত করবার উপযুক্ত তরল পদার্থ (Flushing liquor) পরিপূর্ণ হয়, তখন অ্যাসেনসন পাইপ বা চুল্লীর গ্যাস সংগ্রহকারী নল (Collecting main) থেকে গ্যাস চুল্লীতে ফিরে আসতে পারে না।

এই চুল্লীগুলির গর্ভে কয়লাকে কার্বনাইজ করবার জন্যে এগুলিকে ১১৫০-১৩৫০ ডিগ্রীতে উত্তপ্ত করা হয় এবং তার ফলে কয়লাকে কোকে পরিণত করতে প্রায় ১৮ থেকে ২৪ ঘণ্টা সময় লাগে।

উপরে রিজেনারেটরের কথা বলা হয়েছে। আধুনিক ব্যাটারীর চুল্লীগুলি উত্তপ্ত করবার জন্যে যে রিজেনারেটর ব্যবহার করা হয়, সেগুলি চুল্লীর তলায় রিয়েনফোর্স্‌ড কংক্রিটের (Reinforced concrete) তৈরি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। চারদিক থেকেই রিজেনারেটর পরীক্ষা করা চলে। চুল্লী থেকে কার্বনাইজেসনের ফলে যে গ্যাস উৎপন্ন হয়, তার প্রতি কিউবিক ফুটের উত্তাপের পরিমাণ ৫২৫-৫৫০ বি. টি. ইউ। অন্যান্য কারখানায় এই গ্যাসের

বিশেষ চাহিদা থাকায় অনেক স্থলে এর পরিবর্তে ফ্লুতে প্রডিউসার গ্যাস জ্বালানো হয়। এই গ্যাসের প্রতি কিউবিক ফুটের উত্তাপ ১২৫ থেকে ১৩৫ বি. টি. ইউ.। এই গ্যাস কোকের গুঁড়া জ্বালিয়ে তৈরি করা হয়। অনেক সময় এর পরিবর্তে ব্লাস্ট ফার্নেসে যে গ্যাস তৈরি হয়, তাও ব্যবহার কর হয়। এই গ্যাস থেকে মাত্র ৯০-৯৫ বি. টি. ইউ. উত্তাপ পাওয়া যায়। ব্লাস্ট ফার্নেসে (Blast furnace) লোহা পাথর গালিয়ে পিগ আয়রন তৈরি হয়। টাটানগর ষ্টেশনের নিকট দিয়ে যাবার সময় রেলগাড়ী থেকে যে আকাশভেদী চিম্‌নি-গুলিকে দেখা যায়, সেগুলিই ব্লাস্ট ফার্নেসের চিম্‌নি।

শুধু কার্বনাইজেসনের চুল্লীর কথা জানলেই চলবে না, এর জন্যে কি ধরনের কয়লাকে কার্বনাইজ করা হয়, তাও জানতে হবে। নীচে তারই একটা বিবরণ দেওয়া হচ্ছে। টাটা কোম্পানীর (জামসেদপুরের) কারখানায় লোহা গলাবার উপযুক্ত কোক তৈরির জন্যে সাধারণত ঝরিয়ার ১২ থেকে ১৮ সিমের কয়লা ব্যবহৃত হয়। ঝরিয়ার এই কয়লাগুলিতে উদ্বায়ী পদার্থ কম। ভবিষ্যতে ঝরিয়া ছাড়া বোকারো, গিরিডি ও কারহারবারির কয়লাও ব্যবহৃত হবে। অন্যান্য লোহার কারখানায় আমাদের দেশে যে লোহা পাথর (Iron ore) পাওয়া যায়, সেগুলি গলাবার জন্যে যে ধরনের কয়লা থেকে উপযুক্ত কোক তৈরি হতে পারে তাদের বিশ্লেষণ ফল এইরূপ হওয়া চাই। যে সব কয়লার শতকরা ৩০ ভাগ উদ্বায়ী পদার্থ থাকে, তাদের ছাইয়ের অংশ শতকরা ২৬ ভাগ ও ছাই শতকরা ১৫ ভাগ হওয়া চাই—ফস্‌ফরাসের অংশ শতকরা ০'১৫ ভাগের বেশী হবে না এবং সালফার বা গন্ধকের অংশ ০.৬ ভাগের বেশী হবে না।

কোক তৈরির কারখানায় রেলওয়ে ওয়াগনে কয়লা এসে পৌছুলে সেগুলিকে ইয়ার্ডে নামিয়ে নেওয়া হয়। সেখান থেকে পরিচালনকারী বেল্টের মাধ্যমে (Conveyor belt) কয়লার চ্যাঙরগুলিকে গুঁড়া করবার জন্যে চূর্ণ করবার বিভাগে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। গুঁড়া করবার জন্যে পালভেরাইজার (Pulveriser) নামক যন্ত্রের সাহায্য নেওয়া হয়। বড় বড় কারখানায় ঘণ্টায় ২৫০-৩০০ টন কয়লা গুঁড়া করবার ব্যবস্থা আছে। কয়লার গুঁড়া থেকে লৌহ জাতীয় পদার্থগুলিকে বের করে নেবার জন্যে চুম্বকের সাহায্য নেওয়া হয়। Magnetic Separator নামক যন্ত্রে চুম্বক থাকে বলেই এই

যন্ত্রের সাহায্য নেওয়া হয়। এর পর ডবল রোলার ক্রাসার নামক যন্ত্রের (Double Roller Crusher) সাহায্যে কয়লাকে ৪০ মিলিমিটার সাইজের চূর্ণে পরিণত করা হয়। তারপর ইমপ্যাক্ট মিল (Impact Mill) নামক যন্ত্রে শতকরা ৮০ ভাগ গুঁড়াকে ৩ মিলিমিটার সাইজের চূর্ণে পরিণত করা হয়। সর্বশেষ হ্যামার মিলে (Hammer Mill) শতকরা ৯৫ ভাগ গুঁড়াকে ৩ মিলিমিটারের চেয়েও ছোট সাইজে পরিণত করা হয়।

আজকাল আমাদের খনি থেকে যে সব কয়লা উঠছে, তার ছাইয়ের অংশ শতকরা ১৫ ভাগেরও বেশী ; কাজেই তার ছাই কমাবার জন্যে কয়লাকে ধৌত করবার (Washing) ব্যবস্থা হয়েছে ও হচ্ছে। ধৌত করা মানে শুধু জল দিয়ে ধোয়া নয়, এটি একটি বিশেষ প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ার কথা পরে আলোচনা করবো। কয়লা ধৌত করবার (Coal Washing) জন্যে পাঁচটি কারখানা খোলা হয়েছে। প্রথমটি হচ্ছে ডুগ্‌ডা (Dugda) নামক স্থানে। এখানে রুরকেলা ও ভিলাইয়ের লোহার কারখানায় কার্বনাইজেসন করবার জন্যে কয়লা ধোওয়া হবে। দ্বিতীয়টি পাথেরদিস (Patherdis) নামক স্থানে। ইণ্ডিয়ান আয়রন ও ষ্টিল কোম্পানীর ব্যবহারের জন্যে এখানে কয়লা ধৌত করা হবে।

তৃতীয়টি কারগালি নামক স্থানে। এখানেও ভিলাই ও রুরকেলার জন্যে কয়লা ধৌত করা হবে। দুর্গাপুর লোহার কারখানার জন্যেও একটা কয়লা ধৌত করবার স্টেশন খোলা হবে।

কয়লা ধৌত করবার জন্যে কয়লাকে খানিকটা গুঁড়া করতে হবে ; কাজেই ধৌত করবার জন্যে যতখানি গুঁড়া করতে হবে, ধৌত করবার পর সেখান থেকে বাকীটুকু করবার জন্যে যা কিছু করা দরকার, তা লোহার কারখানায় বা কার্বনাইজেসনের কারখানাতেই করতে হবে।

কোক তৈরির জন্যে সাধারণত এক প্রকার কয়লার গুঁড়ারই ব্যবহার হয় না, বিভিন্ন প্রকারের কয়লার গুঁড়ার মিশ্রণ তৈরি করা হয়। ভারতীয় কয়লার মধ্যে যেগুলির কেকিং ইণ্ডেক্স (Caking Index) ১৫, তাদের চূনের সঙ্গে শতকরা ৩০-৪০ ভাগ ১৩-১৪ কেকিং ইণ্ডেক্সের, শতকরা ২০-৩০ ভাগ ৮-১২ কেকিং ইণ্ডেক্সের এবং শতকরা ১০-২০ ভাগ ৮-এর চেয়ে কম কেকিং ইণ্ডেক্সের কয়লার চূর্ণের মিশ্রণ (Blending) করা চলে। তাছাড়া কয়লার গুঁড়ার সঙ্গে শতকরা ৫ ভাগ কোকের গুঁড়া মিশ্রিত করা হয়।

ঝরিয়ার ১০ নং সিমের নীচের সিমের কয়লাগুলিতে ছাইয়ের অংশ খুব বেশী ; তাই এই কয়লা থেকে কোক পাওয়া গেলে সেই কোক লোহা গলাবার কাজে আসে না। সে জন্যে এই কয়লাগুলিকে কম ছাইযুক্ত কয়লার সঙ্গে মিশ্রিত করতে হয়।

রাণীগঞ্জের দিসেরগড় ও পনিয়াটি সিমের কয়লাগুলির কোক তৈরির ক্ষমতা আছে ; তাই মিশ্রণের (Blending) কাজে এগুলির ব্যবহার হয়। বিভিন্ন কয়লা বা কোকের গুঁড়াকে মিশ্রণের জন্যে বড় বড় (১০০-১৫০ টন মাল ধরে) বালতিতে (Bins) রাখা হয়। মিশ্রণের জন্যে ৫০০ টন মাল ধরে এমন বালতি ব্যবহার করা হয়। ইলেক্‌ট্রো-ম্যাগ্‌নেটিক (Electro-Magnetic) ব্যবস্থার ফলে মিশ্রণের জন্যে যে কোন বালতি থেকে যত ইচ্ছা মাল নেওয়া চলে। কয়লা মিশ্রণের জন্যে যে পাত্রের ব্যবহার হয়, তার নাম ওয়ার্ম্‌স্ (Worms)।

ভারতে যে সব ধরনের কোক ওভেন (Coke ovens) আছে, তাদের নাম ও প্রত্যেক শ্রেণীর কতগুলি চুল্লী আছে এবং তাদের মাধ্যমে কতটা কয়লাকে কার্বনাইজেসন করা যায়, তা নিম্নে দেখানো হলো—

শ্রেণী	চুল্লীর সংখ্যা	বাৎসরিক কয়লা কার্বনাইজেসনের পরিমাণ
সাইমন কার্ভেস (Simon carves)	৬৭০	৩২২৭১০০ টন
উইলপুট (Wilputte)	৫০	২৮৮০০০ টন
কপার্স (Coppers Regenerative)	৪০	৯৮০০০ টন
সেমেট সলভে (Semet Solvey Waste heat)	২৫	৭৮০০০ টন
	মোট ৭৮৫	৩৬৯১১০০ টন

এর মধ্যে কোন্ কোন্ কারখানায় কোন্ শ্রেণীর কত চুল্লী আছে, তা নিম্নে দেখানো হলো—

বাৎসরিক যে পরিমাণ কয়লা কার্বনাইজ করা যেতে পারে।		চুল্লীর শ্রেণী	সংখ্যা
১৬৯২০০০	টাটা আয়রন অ্যাণ্ড স্টিল কোং লিঃ (Tata Iron & Steel Co. Ltd., Jamshedpur)	সাইমন কার্ভেস	১৬৪
		উইলপুট	৫০
২৯০৬০০	ইণ্ডিয়ান আয়রন অ্যাণ্ড স্টিল কোং লিঃ (Indian Iron & Steel Co. Ltd. Kulti.)	সাইমন কার্ভেস	১০২
		„ (রিজেনারেটর)	৩০
		ওয়েষ্ট হিট	
২১৫৫৫০০	„ হীরাপুর	সাইমন কার্ভেস	
		রিজেনারেটর	৮০
		ওয়েষ্ট হিট	৪০
		কম্পাউণ্ড	১১২
১৫০০০০	স্টেট রেলওয়ে কোল ডিপার্টমেণ্ট (State Rly. Coal Dept. Giridhi.)	সাইমন কার্ভেস	৫০
		ভার্টিক্যাল	
১৩২০০০	লোডনা কোলিয়ারী (Lodna Colliery)		
৯০,০০০	বারোরি কোক কোং (Barori Coke Co.)	সাইমন কার্ভেস	৬০
৯৮,৩০০	বরাকর কোল কোং (Barakar Coal Co.)	কপার্স'	৪০
৭৮০০০	ভাওড়া কোক কোং লিঃ (Bhowra Coke Co. Ltd.)	সেমেট সলভে	২৫

মোট ৩·৬ মিলিয়ন টন

১৯৫৬ সালে ভারতে মোট ২.৫ মিলিয়ন টন হার্ড কোক তৈরি হয়েছিল। এর মধ্যে ষ্টিল প্ল্যাণ্টে (Steel Plant) ১.৭ মিলিয়ন টন হার্ড কোক তৈরি হয়েছিল।

কার্বনাইজেসন প্রক্রিয়াটি চালাবার জন্যে চুল্লীতে নিম্নলিখিত যন্ত্রগুলির ব্যবহার হয়—

১। পুসার (Pusher machine)—এই যন্ত্রের সাহায্যে কোকের চ্যাঙ্গর চুল্লী থেকে ঠেলে বের করে দেওয়া হয়।

২। চুল্লীর দরজা খোলা ও বন্ধ করবার যন্ত্র—একে কোক এক্সট্রাক্টর বলা হয়।

৩। চার্জিং কার (Charging Car)—রেলওয়ে ওয়াগনের মত ছাদবিহীন গাড়ী। এই গাড়ীতে চুল্লী থেকে সদ্যনির্গত টকটকে লাল প্রজ্জলিত কোকের চ্যাঙ্গর ঠেলে ফেলা হয়।

৪। একখানি ইঞ্জিন—উত্তপ্ত কোক ভর্তি ওয়াগনকে চার্জিং কারখানায় কোয়েঞ্চিং শেডে (Quenching shed) বয়ে নিয়ে যায়।

চুল্লীর দরজার নাম উল্ফ্ দরজা (Wolf door)। চুল্লীর দরজা দুটি যাতে এয়ার টাইট (Air tight) অবস্থায় বন্ধ হতে পারে, তার জন্যে পুসার ও এক্সট্রাক্টরে রীতিমত ব্যবস্থা আছে। কোক ওভেন ব্যাটারী থেকে একটু দূরে অবস্থিত কোয়েঞ্চিং টাওয়ারের জলের সাহায্যে প্রজ্জলিত কোককে নিবাবার ব্যবস্থা আছে। কোয়েঞ্চিং টাওয়ার একটি দোতলা সমান উঁচু গম্বুজ। যথেষ্ট পরিমাণ জল এতে মজুদ রাখা হয়। সেট্লিং ট্যাঙ্ক (Settling tank) নামক একটি ছোট পুকুর কোয়েঞ্চিং প্ল্যাণ্টের (Quenching plant) অন্তর্ভুক্ত। সেট্লিং ট্যাঙ্কে কোক ধোয়া জল ও তার সঙ্গে কোকের গুঁড়া এসে জমা হয়। কোকের চ্যাঙ্গরগুলিকে নিবিয়ে দেবার পর চার্জিং কার থেকে চ্যাঙ্গরগুলিকে হোয়ার্ভ্সের (Wharves) উপরে ফেলা হয়। হোয়ার্ভ্সগুলি লোহার প্লেট (Cast iron plate) দিয়ে ঢাকা থাকে। প্রত্যেকটি হোয়ার্ভ্স লম্বায় প্রায় পৌনে দুই মিটার। এতে প্রায় পনেরো-বিশটা চুল্লীর কোক ধরে। হোয়ার্ভ্সের দরজাগুলি বেশ শক্ত ষ্টিলের শিক দিয়ে তৈরি হোয়ার্ভ্স থেকে কোকের চ্যাঙ্গর-গুলিকে বেল্ট কনভেয়ারের (Conveyor) সাহায্যে স্ক্রিনিং প্ল্যাণ্টে (Screening

plant) পাঠানো হয়। এখানে কোকগুলিকে তাদের সাইজ অনুসারে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে ভাগ করা হয়—

	সাইজ
বড় কোক (Large Coke)	৪০/১০০ সি সি
ছোট কোক (Small Coke)	২২/৪০ ”
পার্ল কোক (Pearl Coke)	১০/২২ ”
কোক ব্রিজ (Coke breeze)	০/১০ ”

এর মধ্যে বড় ও ছোট কোকগুলিকে বেল্ট কনভেয়ারের সাহায্যে ব্লাস্ট ফার্নেসে পাঠানো হয়। ব্লাস্ট ফার্নেসে লোহা গলাবার কাজে এই কোকের প্রয়োজন হয়। এই মেটালার্জিক্যাল কোকে অন্ততঃ শতকরা ৪০ ভাগ ছিদ্র থাকা চাই এবং চাপ সহ্য করবার ক্ষমতাও থাকা চাই, অর্থাৎ সহজে যাতে গুঁড়া না হয়, এরূপ হওয়া চাই। এতে শতকরা ১০ ভাগ ছাই, ১·১২৫ ভাগ সালফার (গন্ধক) এবং ০·০২ ভাগ ফস্‌ফরাস থাকা চাই। তবে লোহা পাথর (Ore) উৎকৃষ্ট ধরনের হলে ছাইয়ের অংশ শতকরা ২০-২২ ভাগ থাকলেও ক্ষতি হয় না। এতে উদ্বায়ী পদার্থের অংশ শতকরা ১·০ ভাগ, স্থায়ী কার্বন (Fixed carbon) শতকরা ৭৫ ভাগ থাকে।

এই প্রসঙ্গে জেনে রাখা ভাল যে, ফাউণ্ড্রির জন্যে যে কোক ব্যবহার করা হয়, তার ক্যালরিফিক ভ্যালিউ (Calorific value) বা উত্তাপ-শক্তি উচ্চ হওয়া চাই। ভার ও চাপ সহ্য করবার জন্যে এর ছাইয়ের অংশ শতকরা ৮ ভাগ, গন্ধকের অংশ শতকরা ০·৮ ভাগ, ফস্‌ফরাসের অংশ ০·০২ ভাগ, জলীয় অংশ শতকরা ১·৫ ভাগের বেশী এবং স্যাটার ইণ্ডেক্স (Shatter Index) শতকরা ৯০-এর উপরে হলে তার দ্বারা কাজ চলে না।

প্রডিউসার গ্যাস প্ল্যাণ্টের (Producer gas plant) জন্যে যে কোকের প্রয়োজন, তার উচ্চদরের রিয়্যাক্টিভিটি (Reactivity), অর্থাৎ পোড়বার ক্ষমতা (Combustibility) এবং কার্বন ডাইঅক্সাইডকে কার্বন মনোক্সাইডে পরিবর্তন (Reduction) করবার ক্ষমতা থাকা চাই। তাছাড়া জলীয় বাষ্পের সঙ্গে রাসায়নিক ক্রিয়া করবার ক্ষমতা থাকা চাই।

ভারতীয় লোহার কারখানায় লোহা গলাবার জন্যে যে ধরনের কোক ব্যবহৃত হয়, তার বিশ্লেষণ ফল এরূপ—

যে সব কয়লায় শতকরা ৩০ ভাগ উদ্বায়ী পদার্থ থাকে, তাদের ছাই শতকরা ১৫ ভাগের বেশী নয়। ফস্ফরাস ০·১৫ ও গন্ধক ০·৬-এর বেশী নয়। কোকগুলির কেকিং ইণ্ডেক্স (Caking Index) ১৫ হওয়া চাই, অর্থাৎ বি. এস. এস. (B. S. S.) ইণ্ডেক্স ২২·৫ হওয়া চাই।

আমাদের দেশে সর্বপ্রথম গিরিডিতে ঈস্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানীর জন্যে সাইমন কার্ভেস টাইপের পঞ্চাশটি চুল্লীতে কার্বনাইজেসন প্রক্রিয়া চালু হয়েছিল।

কার্বনাইজেসন প্রক্রিয়ার ফলে কয়লা থেকে যেমন চুল্লীর মধ্যে কোক তৈরি হয়, তেমনি প্রায় ১২০০ ডিগ্রী উত্তাপের ফলে কয়লার ভিতর থেকে নানারূপ গ্যাস উৎপন্ন হয়। ঐ গ্যাসগুলির পরস্পরের মধ্যে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে অবশেষে যে গ্যাস পাওয়া যায়, তা অ্যাসেন্সন পাইপ হয়ে কোক ওভেন প্ল্যাণ্টের (Coke oven plant) কালেক্টিং মেনে (Collecting main) এসে উপস্থিত হয়—একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। Collecting main-কে হাইড্রলিক মেনও বলা হয়। হাইড্রলিক মেনে আলকাত্‌রার বাষ্পীয় অংশ ঠাণ্ডা হবার ফলে আলকাত্‌রারূপে জমা হয় এবং জলীয় বাষ্প জলে পরিণত হয়ে তাতে জমা হয়।

কার্বনাইজেসন প্রক্রিয়ার মুখ্য ফল কয়লার রূপান্তর কোক। হাইড্রলিক মেনে যে গ্যাস এসে উপস্থিত হয়, তাতে নানা প্রকার উপজাত পদার্থ থাকে। এবার আমরা এই উপজাত পদার্থগুলির (By-products) কথাই বলবো।

উপজাত পদার্থ উপচয়ন (By-products recovery)

কোক চুল্লী থেকে গ্যাস হাইড্রলিক মেনে উপস্থিত হবার সময় একটু ঠাণ্ডা হয়ে যায়। ঠাণ্ডা হবার দরুণ গ্যাসের কিছু অংশ তরল হয়ে যায় এবং হাইড্রলিক মেনে ঐ তরল অংশ আলকাত্‌রা রূপে জমা হয়। হাইড্রলিক মেন থেকে গ্যাসীয় অংশকে ঠাণ্ডা করবার জন্যে ফাউল বা সাক্সন পাইপের (Foul or Suction main) মাধ্যমে কন্‌ডেন্সারে (Condenser) নিয়ে যাওয়া হয়। ফাউল মেনেও কিছু আলকাত্‌রা জমা হয়। কন্‌ডেন্সারগুলিকে (অর্থাৎ যেখানে গ্যাসীয় অংশকে পূর্ণমাত্রায় তরল অংশে পরিণত করা হয়) বায়ু বা জলের দ্বারা ঠাণ্ডা রাখা হয়। কন্‌ডেন্সারে আলকাত্‌রার বাষ্পের প্রায় সবটাই

আলকাত্‌রায় পরিণত হয়ে যায় এবং অ্যামোনিয়া গ্যাসের অধিকাংশটাই জলে গুলে যায়। জলীয় অংশ ও তরল আলকাত্‌রার অংশটাকে কন্‌ডেন্সার থেকে আলকাত্‌রা সংগ্রহ করবার কুয়োতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এই কুয়োতে আলকাত্‌রা ও জলীয় অংশ জমে দুটি স্তর দেখা দেয়। এই দুটি স্তরের তরল পদার্থকে পরে আলাদা করা হয়। উপরের জলীয় অংশের সামান্য কিছুটা হাইড্রলিক মেনে ব্যবহার করা হয় এবং বাকী অংশ থেকে অ্যামোনিয়া উদ্ধারের জন্যে অ্যামোনিয়াম সাল্‌ফেট প্ল্যাণ্টে পাঠানো হয়। কোক চুল্লী থেকে গ্যাসকে কন্‌ডেন্সারে আনা এবং সেখান থেকে পিউরিফাইং প্ল্যাণ্টে (Purifying plant) পাঠাবার জন্যে এক্সজস্টার (Exhauster) নামক যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। এক্সজস্টার যন্ত্রটি কন্‌ডেন্সার ও পিউরিফাইং প্ল্যাণ্টের মাঝখানে থাকে। পিউরিফাইং প্ল্যাণ্টের অনেকগুলি বিভাগ আছে। যথাক্রমে তাদের নাম দেওয়া হচ্ছে—

১। আলকাত্‌রা ধোঁয়া পরিষ্কারক যন্ত্র (Tar fog purifier)। এখানে গ্যাসকে তরল অ্যামোনিয়ার ভিতর দিয়ে চালানো হয়। আলকাত্‌রা ও তার ধোঁয়া আলাদা করবার জন্যে সাইক্লোন ও ইম্প্যাক্ট এক্সট্র্যাক্টরের ব্যবহার হয়। তাছাড়া ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক উপায়েও আলকাত্‌রাকে তরল পদার্থে পরিণত করা হয়ে থাকে।

২। অ্যামোনিয়া স্ক্রুবার (Ammonia Scrubber)। এই যন্ত্রের মাধ্যমে গ্যাসের বাকী অ্যামোনিয়া অংশকে গ্যাস থেকে আলাদা করে নেওয়া হয়।

৩। বেঞ্জোল নিষ্কাশন গম্বুজ (Benzol scrubbing tower)। এখানে গ্যাসের বেঞ্জোল অংশকে আলাদা করে নেবার জন্যে বেঞ্জোল দ্রবীভূত করবার মত শক্তিসম্পন্ন একটি তরল পদার্থে ক্রিয়োজোট অয়েল (Creosote oil) বা পেট্রোলিয়াম অয়েল (Petroleum oil) এই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়।

৪। আয়রন অক্সাইড পিউরিফাইয়ার (Iron oxide purifier)। এখানে গ্যাস থেকে হাইড্রোজেন সালফাইডকে (Hydrogen sulphide) আলাদা করবার জন্যে আয়রন অক্সাইডের (এক প্রকার গেরি মাটি) ব্যবহার হয়।

কোক-চুল্লীর গ্যাসের প্রতি শত কিউবিক ফিটে প্রায় ১২ গ্রেন হাইড্রোজেন সায়ানাইড থাকে। এর শতকরা ৩০ ভাগকে অ্যামোনিয়াম

সায়ানাইড (Ammonium cyanide) এবং থিয়োসায়ানেট আকারে বের করে নেওয়া হয়। বাকী অংশটাকে আয়রন অক্সাইডের ভিতর দিয়ে চালাবার ফলে ফেরোসায়ানাইড ও থিয়োসানেটে পরিবর্তিত হয়। হাইড্রোজেন সায়ানাইডকে অ্যালকালাইন ফেরাস সালফেট গোলার মধ্য দিয়ে চালিত করলেও গ্যাস থেকে আলাদা করে বের করে নেওয়া যায়।

এভাবে গ্যাস থেকে উপজাত পদার্থের কিয়দংশ বের করে নিয়ে বাকী গ্যাসকে জ্বালানি হিসাবে বা গ্যাস থেকে আলো পাওয়ার জন্যে ব্যবহার করা হয়।

এই হলো মোটামুটি কথা। এখন বিশদভাবে এগুলির আলোচনা দরকার।

অ্যামোনিয়া উদ্ধার

কোল গ্যাস থেকে অ্যামোনিয়া উদ্ধারের নানা উপায় আছে। কুলার্স বা স্ক্রুবার্স (Coolers & Scrubbers) যখন অ্যামোনিয়াকে তরল অবস্থায় পাওয়া যায়, তখন অ্যামোনিয়া লিকার্সের সঙ্গে চুন-গোলা (Milk of lime) মিশিয়ে ঐ মিশ্রিত তরল পদার্থকে বাষ্পের সাহায্যে ডিষ্টিলেসন করা হয়। রাসায়নিকেরা একে ষ্টিম ডিষ্টিলেশন (Steam distillation) বলেন। আলকাত্‌রার ধোঁয়া (Fog) মুক্ত না করে গ্যাস থেকে অ্যামোনিয়া উদ্ধারের জন্যে গ্যাসকে সোজাসুজি স্যাচুরেটরের (Saturator) ভিতর দিয়ে চালান করা হয়। স্যাচুরেটরে ডাইলিউট সালফিউরিক অ্যাসিড থাকে। সালফিউরিক অ্যাসিডের সঙ্গে অ্যামোনিয়া মিলিত হলে অ্যামোনিয়াম সালফেট তৈরি হয়। এই প্রথায় অ্যামোনিয়াম সালফেটের যে দানা পাওয়া যায়, সেগুলি একটু রঙীন হয়। গ্যাসকে প্রথমত ঠাণ্ডা করে নিয়ে কুলারের ভিতর চালান করলে কুলারের ঠাণ্ডায় গ্যাসের আলকাত্‌রার অংশ তরল আকারে পরিবর্তিত হয়ে জমা হয় (condensed) এবং গ্যাস আলকাত্‌রা বিমুক্ত হয়। এই আলকাত্‌রা বিমুক্ত গ্যাসের সঙ্গে অ্যামোনিয়া লিকার থেকে প্রাপ্ত অ্যামোনিয়া গ্যাসকে মিলিয়ে স্যাচুরেটরের ভিতর দিয়ে চালান করা হয়। এর ফলে অ্যামোনিয়াম সালফেটের যে দানা পাওয়া যায়, সেগুলি হয় ধবধবে সাদা।

অ্যামোনিয়াম সালফেটের দানাগুলি স্যাচুরেটরের নীচের অংশে জমা হয়। ঐ স্থান থেকে বাষ্প বা চাপযুক্ত বায়ুর (Compressed air) সাহায্যে একটা টেবিলের উপর আনা হয়। এই টেবিলের উপর এগুলিকে বিছিয়ে দিলে মাদার লিকারটি (Mother liquor) ঝরে যায়। যে তরল অংশ থেকে দানা জমতে পারতো অথচ জমে না, তাঁকে মাদার লিকার বলা হয়। মাদার লিকার গড়িয়ে যাবার পর অ্যামোনিয়াম সালফেটের দানাগুলিকে অ্যাসিড বিমুক্ত করে সেন্ট্রিফিউজ (Sentrifuge) করা হয়। তারপর বাষ্পের দ্বারা উত্তাপিত (Steam heated) ড্রাইয়ারের (Dryer) সাহায্যে জলীয় অংশ (Moisture) থেকে মুক্ত করা হয়। তারপর বস্তায় ভর্তি করে বাজারে পাঠানো হয়। দানাগুলিকে সম্পূর্ণভাবে অ্যাসিড ও জলীয় অংশ থেকে বিমুক্ত না করলে ডেলা পাকিয়ে যায়। অ্যাসিড অংশ থেকে বিমুক্ত করবার জন্যে অ্যামোনিয়া বা অ্যামোনিয়াম কার্বনেট ব্যবহার করা হয়। প্রতি টন কয়লা কার্বনাইজেসনের ফলে ২০-২৮ পাউণ্ড অ্যামোনিয়াম সালফেট পাওয়া যায়। ভারত বিচ্ছিন্ন হবার পূর্বে কার্বনাইজেসনের ফলে ভারতে বাৎসরিক প্রায় ২০,০০০ টন অ্যামোনিয়াম সালফেট এইভাবে উৎপন্ন হতো এবং তার সবটাই জমির সাররূপে ব্যবহৃত হতো।

উড়িষ্যার রুরকেলায় যে লোহা ও ইস্পাত তৈরির কারখানা তৈরি হচ্ছে, সেখানকার কোক-চুল্লী থেকে ১'৩৪ মিলিয়ন কিউবিক মিটার গ্যাস তৈরি হয়। ঐ গ্যাসকে প্রথমে একটি কুলারের মধ্য দিয়ে চালান করে ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক ডিটারারের (Electrostatic ditarrer) ভিতর আনা হবে। এখানে গ্যাসের আলকাত্‌রার অংশটিকে গ্যাস থেকে আলাদা করে নেওয়া হবে, পরে আলকাত্‌রাবিহীন গ্যাসের দুটি ধারায় গ্যাসকে একত্রিত করে শেষের (Final) কুলারে (Cooler) পাঠানো হবে। হাইড্রলিক মেন থেকে গ্যাসকে এই পথ দিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে টার্বো গ্যাস এক্সজস্টারের (Turbo gas exhauster) সাহায্য নেওয়া হবে। গ্যাস রীতিমত ঠাণ্ডা থেকে অ্যামোনিয়াকে বিচ্ছিন্ন করবার জন্যে স্টেজ ওয়াসারে (Stage washers) জলের ব্যবহার করা হবে। জলের সঙ্গে মিলিত হয়ে যে অ্যামোনিয়া লিকার তৈরি হবে তাতে অ্যামোনিয়ার অংশ বেশী থাকবে না, জলের অংশই বেশী থাকবে। এই জলীয় অ্যামোনিয়া লিকারে কিছু কার্বলিক অ্যাসিড থেকে

যাবে। সে জন্যে এথেকে কার্বলিক অ্যাসিডকে পৃথক করবার উদ্দেশ্যে লিকারটিকে ডিফেনোলাইজিং প্ল্যাণ্টে পাঠানো হবে। সেখানে বেঞ্জোলের সাহায্যে কার্বলিক অ্যাসিডকে আলাদা করা হবে, তারপর অ্যামোনিয়া লিকারটিকে কন্‌সেন্‌ট্রেশন (Concentration) প্ল্যাণ্টে পাঠানো হবে। এখানে লিকারটিকে জ্বাল দিয়ে কিছু জলীয় অংশ বের করে দেওয়া হবে। লিকারে যখন শতকরা :৫ ভাগ অ্যামোনিয়া থাকবে, তখন তাকে ফার্টিলাইজার প্ল্যাণ্টে (Fertiliser plant) পাঠানো হবে। সেখানে সালফিউরিক অ্যাসিডের সঙ্গে মিলে অ্যামোনিয়াম সালফেট তৈরি হবে। ডিফেনোলাইজিং প্ল্যাণ্টে কার্বলিক অ্যাসিডের অংশটিকে বেঞ্জোলের সাহায্যে গ্যাস থেকে বের করে নেওয়া হবে। বেঞ্জোল ও কার্বলিক অ্যাসিডকে আলাদা করবার জন্যে ডিষ্টিলেশন (Distillation) প্রক্রিয়ায় সাহায্য নেওয়া হবে।

বেঞ্জোল (Benzol) উদ্ধার

অ্যামোনিয়া ও আলকাত্‌রা বের করে নেবার পর গ্যাসে বেঞ্জিন টলুয়িন, জাইলিন (Benzene, Toluene, Xylene) প্রভৃতি অনেক রাসায়নিক পদার্থ বর্তমান থাকে।

গ্যাস থেকে বেঞ্জোল বের করে নেবার জন্যে ১৯২০ সালেই প্রথম বারোরি কোক কোম্পানীতে বেঞ্জোল প্ল্যাণ্ট বসানো হয়। কয়েক বছর পরে গিরিডিতেও একটি বেঞ্জোল প্ল্যাণ্ট বসানো হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ভারত সরকার টাটা কোম্পানীর জামসেদপুরের ইস্পাতের কারখানায় এবং ইণ্ডিয়ান আয়রন অ্যাণ্ড ষ্টিল কোম্পানীর হীরাপুরের কারখানায় কোক ওভেন প্ল্যাণ্টের গ্যাস থেকে বেঞ্জোল উদ্ধারের জন্যে বেঞ্জোল প্ল্যাণ্ট বসান। বারোরিতে কোক কোম্পানীর কারখানায় বেঞ্জোল উদ্ধারের জন্যে স্ক্রু বারে ক্রিয়োজোট অয়েলের (Creosote oil) ব্যবহার হয়। গ্যাসের বেঞ্জোল অংশটি ক্রিয়োজোট তৈলের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে তার সঙ্গে মিশে যায়। জামসেদপুরের কারখানায় ক্রিয়োজোট অয়েলের পরিবর্তে পেট্রোলিয়াম অয়েল ব্যবহৃত হয়। গ্যাস থেকে বেঞ্জোল বা লাইট অয়েল (Light oil) বের করে নেবার জন্যে যদিও অ্যাক্টিভেটেড কার্বন (Activated carbon) বা সিলিকা জেলের ব্যবহার চলতে পারে, তথাপি কোক ওভেন গ্যাসের ক্ষেত্রে এই প্রথার প্রয়োগ করা হয় না। বেঞ্জোল

অয়েলকে বের করে নেবার পূর্বে গ্যাসকে ১৫ অ্যাটমস্‌ফিয়ার চাপে কম্প্রেস করা হয়। কম্প্রেস করলে গ্যাস গরম হয়ে যায় ; সে জন্যে গ্যাসকে আবার কুলারে ঠাণ্ডা করে ওয়াশ অয়েল পরিপূর্ণ স্ক্রুবারে পাঠানো হয়। বেঞ্জোল সমন্বিত ওয়াশ অয়েল থেকে (Wash oil) লাইট অয়েল বা বেঞ্জোলকে আলাদা করবার জন্যে হিট এক্সচেঞ্জারে (Heat exchanger) ১৫ ডিগ্রি পর্যন্ত উত্তপ্ত করা হয়। তারপর বিচ্ছিন্নকারী ষ্টিলে (Stripping still) ১০ পাউণ্ড চাপে ডিষ্টিল করা হয়। এর ফলে বেঞ্জোল আলাদা হয়ে বেরিয়ে আসে।

বেঞ্জিন, টলুয়িন ও জাইলিন এই বেঞ্জোলের প্রধান অংশ। সে জন্যে একে ডিষ্টিল করে চারটি বিভিন্ন অংশে পরিণত করা হয় ; যথা—মোটর বেঞ্জোল, বেঞ্জিন, টলুয়িন ও জাইলিন। ভারতবর্ষে আজ পর্যন্ত এই বেঞ্জোলকে ডিষ্টিল করে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম ভাগের অধিকাংশই বেঞ্জিন ও কিছুটা টলুয়িন, দ্বিতীয় ভাগে বেশী টলুয়িন ও কিছুটা ন্যাপ্‌থা (Naptha), বাকীটা দ্রবণশীল ন্যাপ্‌থা ও জাইলিন। প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগটি মিশিয়ে মোটর বেঞ্জোল নামে বাজারে চালু করা হয়। তৃতীয় ভাগটিকে বার্ণিশ (Varnish) তৈরির জন্যে বাজারে চালু করা হয়েছে। কোক ওভেন গ্যাস থেকে যে বেঞ্জিনের অংশটি পাওয়া যায়, তার অধিকাংশই মোটর বেঞ্জোল রূপে বাজারে চালু করা হয়। পেট্রোলের সঙ্গে এই মোটর বেঞ্জোল সমান অংশে মিশালে মোটর গাড়ী চালাবার উপযোগী যে তেল তৈরি হয়, তার অ্যান্টি-নক (Anti-knock) গুণ আছে এবং এই মিশ্রিত তেল শুধু পেট্রোল অপেক্ষা ভাল। এর প্রতি গ্যালন, পেট্রোলের প্রতি গ্যালনের চেয়ে বেশী উত্তাপ দেয়, অর্থাৎ এর এক গ্যালনে গাড়ী অনেক বেশী মাইল চলে। রূরকেলাতে ওয়াশ অয়েল (Wash oil) থেকে পৃথক করা বেঞ্জোল অংশটিকে বি. এ. এস. এফ. সোলভেন প্রথায় (B. A. S. F. Scholven Process) পরিশুদ্ধ করা হবে। এখানে বেঞ্জোলকে কোক ওভেন গ্যাসের হাইড্রোজেন গ্যাস দিয়ে ক্যাটালিস্টের (Catalyst) সাহায্যে হাইড্রোজেনেট করা হবে। এর জন্যে ৪০ অ্যাটমস্‌ফিয়ার চাপ ও ৩৫০ ডিগ্রী উত্তাপের সাহায্যে নেওয়া হবে। এভাবে হাইড্রোজেনেট করবার পর তাকে ডিষ্টিল করে বেঞ্জিন, টলুয়িন ও জাইলিনে ভাগ করা হবে। এর ফলে খাঁটি জিনিষগুলি পাওয়া যাবে।

খাঁটি ও পরিশুদ্ধ বেঞ্জিনের বহু প্রকার ঔদ্যোগিক ব্যবহার হয়। পেন্ট, বার্ণিশ, ল্যাকার পালিশ তৈরি করবার জন্যে এর প্রয়োজন হয়। রাসায়নিক উদ্যোগের জন্যে এর বহুল ব্যবহার আছে। একে নাইট্রেসন (Nitration) করে যে নাইট্রো-বেঞ্জিন পাওয়া যায় তাথেকে অ্যানিলিন ও বেঞ্জিডিন (Aniline & Bengidine) নামক রাসায়নিক পদার্থ পাওয়া যায়। এরাই কতকগুলি রঙের জন্মদাত্রী। সালফোনেসন বা ক্লোরিনেসন (Sulphonation and Chlorination) করে বেঞ্জিন সালফোনিক অ্যাসিড ও ক্লোরোবেঞ্জিন নামক পদার্থ দুটি পাওয়া যায়। এদের দ্বারা একদিকে যেমন ফেনোল তৈরি হতে পারে, অপর দিকে তেমনি আবার অনেক রং তৈরির মাধ্যমিক দ্রব্যও তৈরি হতে পারে। সে জন্যে রাসায়নিকেরা এগুলিকে ডাইস্টাফ ইন্টার-মিডিয়েট (Dyestuff Intermediates) বলেন। প্যারা-ডাইক্লোরো-বেঞ্জিন (P-dichlors) এবং ডি. ডি. টি.—এই দুটি ইনসেকৃটিসাইডই (Insecticide) বেঞ্জিন থেকে তৈরি হয়। নাইলনের নাম বেঞ্জিন থেকে তৈরি হয়। ভারতে ১৯৪৮ সালে এক মিলিয়ন গ্যালন মোটর বেঞ্জোল তৈরি হয়েছিল।

টলুয়িন (Toluene)

টলুয়িনের নানা প্রকার ঔদ্যোগিক ব্যবহার আছে। গত মহাযুদ্ধে টি.এন.টি. (T. N. T.) অর্থাৎ ট্রাইনাইট্রো টলুয়িন (যা বিস্ফোরণকারী ·বোমার জন্যে ব্যবহৃত হয়) তৈরির জন্যে অনেক টলুয়িনের প্রয়োজন হয়েছিল। কোক ওভেন গ্যাস থেকে অত পরিমাণ টলুয়িন পাওয়া সম্ভব নয় জেনে রাসায়নিকেরা পেট্রোলিয়াম-ন্যাপ্‌ থাকে (Petroleum Naptha) হাইড্রোফরমিং (Hydroforming) করে টলুয়িন তৈরি করেছিলেন। ঐ সময় ক্যাটালিস্টের সাহায্যে বেঞ্জিনের সঙ্গে সেথানোলের রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে জার্মান রাসায়নিকেরা টলুয়িন তৈরি করেছিলেন।

টলুয়িন থেকে স্যাকারিন ও অন্যান্য নানা রকম ওষুধ তৈরি হয়। তাছাড়া বেঞ্জিনের মত টলুয়িনও নানা প্রকার রঙের জন্মদাত্রী। টলুয়িন থেকে বেঞ্জিল ক্লোরাইড, বেঞ্জাল ক্লোরাইড, বেঞ্জোইল ক্লোরাইড, বেনজোইক অ্যাসিড, বেঞ্জোলডিহাইড, সোডিয়াম বেঞ্জোয়েট, বেঞ্জিন হেক্সাক্লোরাইড প্রভৃতি রাসায়নিক পদার্থগুলি তৈরি হয়।

এছাড়া সলভেণ্ট হিসাবে এর যথেষ্ট ব্যবহার আছে। অ্যালকালয়েড, সেলুলোজ, এস্টার, ল্যাকার, বার্ণিশ, রজন প্রভৃতি রাসায়নিক পদার্থগুলি টলুয়িনের মধ্যে গলে যায়।

জাইলেন্স (Xylence)

রসায়ন শাস্ত্র যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা জানেন যে, তিন প্রকার জাইলিন আছে। কোক ওভেন গ্যাস থেকে যে জাইলিনের অংশটা পাওয়া যায় বা যাবে, তাকে তিনটি বিভিন্ন জাইলিনে আলাদা করবার হয়তো দরকার হবে না। কারণ. রবার, পেণ্ট ও ছাপার কালি তৈরির ব্যাপারে অর্থো, প্যারা এবং মেটা—এই তিন প্রকার জাইলিনেরই মিশ্রণ ব্যবহার করা হয়।

হেভি সলভেণ্ট ন্যাপ্‌থা (Heavy Solvent Naptha)

আগেই বলা হয়েছে যে, ক্রুড বেঞ্জোল থেকে বেঞ্জিন, টলুয়িন ও জাইলিন আলাদা করে নেবার পর যে অংশটা বাকী থেকে যায়, তাকে হেভি ন্যাপ্‌থা বলা হয়। এই পদার্থটিও সলভেণ্ট হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

ভারতে এতদিন পর্যন্ত বেঞ্জিন, টলুয়িন ও জাইলিন তৈরি হয়নি বললে ভুল হবে না, কিন্তু রুরকেলা, ভিলাই ও দুর্গাপুরের লোহার কারখানায় কোক ওভেনগুলি চালু হলে বেঞ্জিন, টলুয়িন ও জাইলিনগুলি খাটি অবস্থায় পাওয়া যাবে।

সালফার বা গন্ধক

কোক ওভেন গ্যাসের ভিতর কয়লার গন্ধকের অংশটি হাইড্রোজেন সালফাইডের আকারে বর্তমান থাকে। আলকাত্‌রা, অ্যামোনিয়া ও বেঞ্জোল উদ্ধার করে নেবার পর গ্যাসটি কোক চুল্লীতে উত্তাপ দেওয়া বা ইস্পাত তৈরির চুল্লীকে গরম করবার জন্যে ব্যবহার করতে হলে হাইড্রোজেন সালফাইডকে গ্যাস থেকে বের করে নেবার দরকার হয় না। কিন্তু জনসাধারণের উনুন জালাবার জন্যে অথবা গ্যাস জেলে আলো পাবার জন্যে ব্যবহার করতে হলে হাইড্রোজেন সালফাইডকে বের করে নিতে হয়। এর জন্যে নানা প্রকার

উপায় আবিষ্কৃত হয়েছে। হাইড্রোজেন সালফাইড স্ক্রুবারে সোডিয়াম কার্বনেট সলিউসন (Sodium carbonate solution) বা পটাস সলিউসন (Potash solution) যখন ব্যবহার করা হয়, তখন তাকে সিবোর্ড প্রথা (Seaboard Process) বলা হয়। গার্বিটোল (Gerbitol) প্রথায় ইথানোল অ্যামিন Ethanolamin) ব্যবহৃত হয়। রুরকেলায় পটাস সলিউসনের ব্যবহার হবে। পটাস সলিউসনকে ডিষ্টিল করে হাইড্রোজেন সালফাইডকে আলাদা করে নেওয়া হবে। তারপর তাকে পুড়িয়ে সালফার ডাইঅক্সাইডে পরিণত করে তাথেকে সালফিউরিক অ্যাসিড তৈরি হবে। গন্ধক তৈরির জন্যে ফেরক্স প্রথার (Ferrox Process) সাহায্য নেওয়া হয়। এখানে আয়রন অক্সাইডের (Iron oxide) ব্যবহার হয়।

আলকাত্‌রা (Tar)

কোক ওভেন গ্যাস যখন হাইড্রোলিক মেন এবং প্রাইমারি কুলারে ঠাণ্ডা হতে থাকে, তখন ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক ডিটারারের সাহায্যে আলকাত্‌রা ও আলকাত্‌রার বাষ্পকে গ্যাস থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়। আলকাত্‌রা, জলীয় অংশ এবং ফ্লাশিং লিকার (Flushing liquor) প্রভৃতি তরলিত পদার্থগুলিকে অন্যত্র সংগ্রহ করা হয় এবং পরে আলকাত্‌রাকে জলীয় অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়।

আলকাত্‌রাকে পাইপ ষ্টিল ফার্নেসে (Pipe steel furnace) ডিষ্টিল করা হয়। প্রথমত একে সাধারণ বায়ুর চাপে (Atmospheric Pressure) এবং পরে ভ্যাকুয়ামে (Vacuum) ডিষ্টিল করা হয়। রুরকেলাতে আলকাত্‌রাকে ডিষ্টিল করে নিম্নলিখিত অংশে ভাগ করা হবে—

১। হাল্‌কা তেল (Light oil)।

২। কার্বলিক অয়েল (Carbolic oil)। এর সঙ্গে ডিফেনো-লাইজিং প্ল্যাণ্ট থেকে যে ফেনোল পাওয়া যাবে, সেটি মিশ্রিত করে তাথেকে খাঁটি ফেনোল ও ক্রেজোল পাওয়া যাবে।

৩। ক্রুড বেঞ্জোল (Crude Benzole)। একে Fractionating plant-এর মাধ্যমে বেঞ্জোল, টলুয়িন, জাইলিন প্রভৃতি বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করা হবে।

৪। ন্যাপথালিন অয়েল (Npahthalin oil) এথেকে ন্যাপথ্যালিন পাওয়া যাবে।

৫। অ্যানথ্রাসিন অয়েল (Anthracene oil)। ন্যাপথালিন ও অ্যানথ্রাসিন অয়েল থেকে অ্যান্থ্রাসিন পাওয়া যাবে।

৬। পিচ্ (Pitch)।

ফেনোল (Phenol) ও ফরম্যালডিহাইড (Formaldehyde)। ফেনোল ফরম্যালডিহাইড নামক পদার্থটি এক প্রকার প্লাষ্টিকের (Plastic) উপাদান। ভারতে এই প্লাষ্টিকের বহুল চলন হয়েছে। ফেনোলকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে ক্যাপ্রোল্যাকৃটামে পরিণত করে তাথেকে নাইলন তৈরি করা যায়। J. K. Industries, Kotah এইরূপ একটি নাইলনের কারখানা খাড়া করেছেন। তাছাড়া ফেনোল থেকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে আরও অনেক পদার্থ তৈরি করা যেতে পারে। অনেক প্রকার রং, ওষুধ, সুগন্ধি, পিকরিক অ্যাসিড প্রভৃতি নানা জাতীয় পদার্থ তৈরি করা চলবে।

ক্রেজোল (Cresol) সাধারণত ডিসইনফেক্‌ট্যাণ্ট তৈরির কাজে লাগে।

ন্যাপথ্যালিন থেকে রাসায়নিক প্রথার সাহায্যে নানা প্রকার রং তৈরি হয়। এথেকে ডেকানিন ও টেট্রালিন নামক দুটি পদার্থ তৈরি হয়। গত যুদ্ধের সময় এগুলি অনেক স্থলে পেট্রোলের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছিল। এছাড়া গরম কাপড়, জামা, চামড়া প্রভৃতিকে পোকা-মাকড়ের গ্রাস থেকে রক্ষা করবার জন্যে বহু পরিমাণ ন্যাপথালিন ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া এথেকে এক প্রকার কর্পূর (Camphor) তৈরি করা যেতে পারে, যা থেকে প্লাষ্টিক তৈরি করা সম্ভব। এথেকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় আল্‌ফা ও বিটা ন্যাপথোল তৈরি হয়। এই দুটি পদার্থ রং তৈরির অন্যতম উপাদান।

অ্যান্থ্রাসিন (Anthracene) থেকে অনেক প্রকার রং তৈরি হয়, বিশেষত অ্যালিজারিন (Alizarin) জাতীয় রং।

রুরকেলায় যখন উপজাত দ্রব্য চয়নকারী প্ল্যাণ্ট চালু হবে, তখন দৈনিক ৪৪০০ টন কয়লা থেকে কার্বনাইজেসনের ফলে যে পরিমাণ উপজাত পদার্থ পাওয়া যাবে, তার একটা খসড়া নিম্নে দেওয়া হলো—

কোল গ্যাস	...	১৩৪১০০ কিউবিক মিটার
অ্যামোনিয়া লিকার		৭০·৪ কিউবিক মিটার
		লিটার প্রতি ১৫০ গ্রাম অ্যামোনিয়া
বেঞ্জোল	...	২১·৩৫ টন
টলুয়িন	...	৪·৫৬ „
জাইলিন	...	২·২৮ টন
ন্যাপথালিন	...	১৭·২ „
ওয়াশ ওয়েল	...	২৩·৪ „
অ্যানথ্রাসিন	...	৯·৪ „
অ্যানথ্রাসিন অয়েল		৪২·৬ „
পিচ্	...	১১৯·০ „
খাঁটি ফেনোল	...	৬১৫ কিলোগ্রাম (৩৯-৪০° গলে যায়)
খাঁটি ফেনোল		৩৯০ কিলোগ্রাম (৪০°-এর উপরে গলে যায়)
অর্থোক্রেজোল		৪০০ কিলোগ্রাম (২৯-৩০° গলে যায়)
„		২০০ „ (৩০° উপরে গলে যায়)
মেটা-প্যারা ক্রেজোল		
৪২% মেটা		—১২০০ „
৪৮% প্যারা		—৬০০ „
নিউট্র্যাল অয়েল		৬০০০ „
সালফিউরিক অ্যাসিড		১৫·৬৫ টন

ভিলাই ও দুর্গাপুরের ষ্টিলের কারখানায় যে কোক ওভেন প্ল্যাণ্ট চালু হয়েছে, সেখান থেকেও হার্ড কোক, গ্যাস এবং উপজাত পদার্থ পাওয়া যাবে।

লো-টেম্পারেচার কার্বনাইজেসন

লো-টেম্পারেচার কার্বোনাইজেসন (Low-temperature Carbonisation) বলতে আমরা কি বুঝি, তা পূর্বেই বলা হয়েছে। কয়লাকে কোন একটি বদ্ধ চুল্লীতে ৪০০-৫৫০ ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেডে উত্তপ্ত করবার প্রক্রিয়াটিকে লো-টেম্পারেচার কার্বনাইজেসন আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

এই প্রক্রিয়ার ফলে আমরা যে কোক পাই, তা মেটালার্জিক্যাল

কোক, যা ১০০০ ডিগ্রী থেকে ১৩০০ ডিগ্রী উত্তাপে পাওয়া যায়, তাথেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই ধরণের কোককে সাধারণত হাফ কোক বলা হয়। এই প্রক্রিয়ার ফলে যে আলকাত্‌রা পাওয়া যায়, তাও একটি নতুন ধরনের আলকাত্‌রা। এটি হাই-টেম্পারেচার কার্বনাইজেসনের আলকাত্‌রা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। একে আদি আলকাত্‌রা (জার্মান ভাষায় উওরটিয়ার (Urtear) বলা হয়েছে। লো-টেম্পারেচার কার্বনাইজেসনের ফলে কয়লা থেকে যে পরিমাণ আলকাত্‌রা পাওয়া যায়, তার পরিমাণ হাই-টেম্পারেচার কার্বনাইজেসনের ফলে যে আলকাত্‌রা পাওয়া যায়, তার দ্বিগুণ। তাছাড়া এর রাসায়নিক স্বভাবও সম্পূর্ণ পৃথক, অর্থাৎ হাই-টেম্পারেচার কার্বনাই-জেসনের আলকাত্‌রায় যে সব রাসায়নিক পদার্থ আছে, সেগুলি এই আলকাত্‌রায় নেই বললে ভুল হবে না। এই আলকাত্‌রায় যে সব রাসায়নিক পদার্থ আছে, তা হাই-টেম্পারেচারের আলকাত্‌রার অন্তর্ভুক্ত পদার্থ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। লো-টেম্পারেচার কার্বনাইজেসন প্রক্রিয়ার ফলে হাফ কোক এবং আদি আলকাতরা ছাড়াও গ্যাস ও জলীয় অংশ পাওয়া যায়। বহু বছর পূর্বে ইংল্যাণ্ডে লো-টেম্পারেচারে কার্বনাইজেসনের ফলে কোয়ালি নামে এক প্রকার কোক তৈরি করা হয়েছিল। কোয়ালিট (Coalite) কয়লার ন্যায় অতি সহজে জ্বলে উঠবে অথচ কোন ধোঁয়া দেবে না—এরূপ আশা করা হয়েছিল, কিন্তু সে আশা সম্পূর্ণভাবে পূর্ণ হয়নি বলে ইংল্যাণ্ডের গৃহস্বামিনীরা সেগুলি ব্যবহার করতে বিশেষ আগ্রহ দেখাননি। কাজেই কোয়ালিটি প্রথায় কার্বনাইজেসন করবার গৌণ উদ্দেশ্য, আদি আলকাত্‌রা প্রস্তুত করাটাই ভবিষ্যতে মুখ্য উদ্দেশ্যে পরিণত হয়—হাফ বা অর্ধকোক প্রস্তুত করা গৌণ উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়। ইংল্যাণ্ডে ক্যানেল কোল (Cannel Coal) নামে এক প্রকার কয়লা পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। এই কয়লা থেকে উদ্বায়ী পদার্থ অতিমাত্রায় পাওয়া যায় বলে এর পরিবর্তে লো-টেম্পারেচার কার্বনাইজেসন প্রথায় আদি আলকাত্‌রা তৈরি করাই লাভজনক মনে হয়েছিল।

এছাড়া কোয়ালিট প্রথার ফলে যে গ্যাস পাওয়া যায়, তা সাধারণ প্রথায় প্রস্তুত কোল গ্যাস অপেক্ষা অনেক উচ্চাঙ্গের। সে জন্যে এই গ্যাসের সঙ্গে নিকৃষ্টতর গ্যাস মিশ্রিত করে সহর ও ঘরবাড়ী আলোকিত করবার ব্যবস্থা হয়।

গ্যাস তৈরির কারখানার নিকট কোয়ালিট প্রস্তুতের কারখানা খুলে কোয়ালিট প্রথায় উৎপন্ন গ্যাসের সঙ্গে ওয়াটার গ্যাস মিশ্রিত করে এই উদ্দেশ্য ব্যবহৃত হয়েছিল। এছাড়া এই গ্যাস থেকে যথেষ্ট পরিমাণে এক প্রকার তেল পাওয়া যায়, যার সাহায্যে মোটর চালানো হয়েছিল। এই প্রথায় কার্বনাইজেসন করবার জন্যে কাষ্ট আয়রনের (Cast iron) তৈরি রিটর্টের (Retort) ব্যবহার হয়েছিল। এই রিটর্টগুলিকে উত্তপ্ত করবার জন্যে কপারের রিজেনারেটর ওভেনসের (Copper regenerator ovens) প্রথা চালু করা হয়। কয়লা কার্বনাইজেসনের ফলে উৎপন্ন গ্যাসকে অ্যামোনিয়া সেপারেটর ও বেঞ্জোল ওয়াশারের মধ্য দিয়ে চালু করা হতো। প্রত্যেক রিটর্ট থেকে ২৪ ঘণ্টায় ১১.৪ টন কয়লার কার্বনাইজেসন সম্ভব হয়। যে পরিমাণ গ্যাস উৎপন্ন হয়, তার শতকরা ৬০ ভাগ রিটর্টগুলিকে উত্তপ্ত করবার জন্যে ব্যবহৃত হয়েছিল।

এরপর প্রিমিয়ার টারলেস্ ফুয়েল (Premier tarless fuel) প্রথায় বৃটেনে লো-টেম্পারেচার কার্বনাইজেসন করা হয়। এর ফলে যে হাফ কোক পাওয়া যায়, তা কোয়ালিট প্রথায় উৎপন্ন হাফ কোক অপেক্ষা অনেক বেশী কঠিন হয়েছিল। এই প্রথায় যে আদি আলকাত্‌রা পাওয়া যায়, তা ব্যবহৃত কয়লার শতকরা দশ ভাগ। এক্ষেত্রেও প্যারাফিন জাতীয় একপ্রকার মোটর অয়েল পাওয়া যায়।

ডেল মণ্ট এভারেট (Del Monte Everett) প্রথায় লো-টেম্পারেচার কার্বনাইজেসন করবার একটি অন্যতম উপায়। এই প্রক্রিয়ার ফলে যে হাফ কোক পাওয়া যায়, তা গৃহস্বামিনীদের ব্যবহারের উপযোগী হয়। কিন্তু উক্ত কোক মেটালার্জিক্যাল প্রক্রিয়ার জন্যে কাজে লাগে না। এই প্রথায় কার্বনাইজেসনের ফলেও এক প্রকার মোটর অয়েল পাওয়া যায়। হেস এই রিটর্টের কিছু অদল-বদল করেন ; কিন্তু বিশেষ কোন ফল হয়নি।

উপরিউক্ত প্রথাগুলি ছাড়া ক্রফোর্ড (Crowford), সামার (Summer), ল্যাম্পলাউ (Lamplough), ম্যাক লরাঁ (Mc Laurin), বোসটাফ (Bostaph) লো-টেম্পারেচার কার্বনাইজেসনের জন্যে নতুন নতুন প্রথার প্রবর্তন করেন। কিন্তু উপরিউক্ত কোন প্রথার সাহায্যে মেটালার্জিক্যাল কোক তৈরি হয় না।

আমেরিকায় কার্বোকোল প্রথায় কয়লাকে লো-টেম্পারেচারে কার্বনাই-

জেসন করা হয়। এক্ষেত্রে কয়লাকে লো-টেম্পারেচারে কার্বনাইজেসন করবার ফলে যে হাফ কোক পাওয়া যায়, তার সঙ্গে পিচ্ (Pitch) মিশিয়ে তাথেকে প্রথমত ব্রিকেট (Brickett) তৈরি করা হয়। এই ব্রিকেটগুলিকে পরে উচ্চ তাপে গরম করা হয়। এর ফলে তাথেকে অ্যামোনিয়া নির্গত হয়ে সেগুলি এক প্রকার ইন্ধনে (Fuel) পরিণত হয়, যা গৃহস্থের উনুনে ব্যবহারের পক্ষে অতি সুবিধাজনক প্রতীত হয়েছিল। তাছাড়া গ্রীন ও লাইক্স প্রথাও চালু হয়েছিল। উপরিউক্ত প্রথাগুলির মধ্যে কোনটিকেই প্রকৃত লো-টেম্পারেচার কার্বনাইজেসন বলা চলে না—ঐগুলি সবই মাধ্যমিক টেম্পারেচারের কার্বনাইজেসন।

প্রকৃত লো-টেম্পারেচার কার্বনাইজেসনের ফলে, অর্থাৎ ৪৪০-৬০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে উত্তপ্ত করবার ফলে হাফ কোক গ্যাস ও আদি আলকাতরা পাওয়া যায়, উপরে তার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে আদি আলকাত্‌রাই সবচেয়ে মূল্যবান পদার্থ। তাই এই আদি আলকাত্‌রা তৈরি করবার জন্যে জার্মানীতে লো-টেম্পারেচার অর্থাৎ ৪০০-৬০০ ডিগ্রী টেম্পারেচারে কয়লাকে কার্বনাইজেসন করবার প্রথা বিশেষভাবে চালু হয়। কিন্তু আদি আলকাত্‌রা সেই সব কয়লা থেকেই যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়, যাতে উদ্বায়ী পদার্থগুলি অধিক মাত্রায় বর্তমান আছে ; যেমন—ইংল্যাণ্ডের ক্যানাল কোল। এছাড়া যে সব কয়লা হাই-টেম্পারেচার চুল্লীতে কোক দেয় না, সেই সব কয়লা থেকেও আদি আলকাত্‌রা পাওয়া যায়, যদি সেগুলি বিটুমিনাস কয়লা হয়।

আমেরিকায় আদি আলকাত্‌রার তেমন চাহিদা না থাকায় লো-টেম্পারেচার প্রথায় কয়লার কার্বনাইজেসন করবার ফলে যে অর্ধ কোক উৎপন্ন হয়, তার আয়ের উপর নির্ভর করে এই উদ্যোগ চালাতে হয়, কিন্তু এথেকে পর্যাপ্ত আয় হয় না বলেই ওদেশে লো-টেম্পারেচারে কয়লা কার্বনাইজ করবার প্রথাটি প্রসার লাভ করেনি।

লো-টেম্পারেচার কার্বনাইজেসন করবার জন্যে বহু রকম প্রথা চালু করা হয়েছে। এই প্রথাগুলিকে সাধারণত দুই ভাগে ভাগ করা চলে। প্রথম প্রথা—যেখানে কয়লাকে বহির্দেশ থেকে উত্তপ্ত করা হয় ; দ্বিতীয় প্রথা—যেখানে কয়লাকে অন্তর্দেশ থেকে উত্তপ্ত করা হয়। কয়লার তাপ সঞ্চালন

ক্ষমতা (Heat conductivity) অত্যন্ত কম বলে বহির্দেশ থেকে লো-টেম্পারেচারে উত্তপ্ত করা একটি সমস্থার বিষয়। এই সমস্যা সমাধানের জন্যে কয়লাকে অতি পাত্‌লা স্তরে বিছিয়ে উত্তপ্ত করতে হয় কিম্বা উত্তপ্ত করবার সময় ক্রমাগত নাড়তে হয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, কোকিং কয়লাকে এভাবে কার্বনাইজ করা চলে না। এটা একমাত্র নন্‌-কোকিং কয়লার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। ইউনাইটেড স্টেট্‌সে আজকাল কয়লাকে লো-টেম্পারেচারে কার্বনাইজেসন করবার জন্যে যে প্রথা চালু আছে, তার মধ্যে ডিস্‌কো প্রথার (Disco Process) নামই উল্লেখযোগ্য।

এই প্রথানুযায়ী কয়লাকে ৬০০ ডিগ্রী ফারেনহাইট অবধি উত্তপ্ত করবার জন্যে রোস্টার (Roaster) নামক যন্ত্রে উত্তাপ দেওয়া হয়। উত্তাপ দেবার সময় কয়লার গুঁড়াগুলিকে ক্রমাগত নাড়তে হয়। যে কয়লা উচ্চাঙ্গের কোক প্রস্তুত করতে সক্ষম, তাদের বেলায় উত্তাপ দেবার সময় রোস্টারে কিছু বায়ু সরবরাহ করতে হয়। এই বায়ুর সাহায্যে অক্সিডেসন (Oxidation) প্রক্রিয়া সুরু হওয়ায় উত্তপ্ত গলিত কয়লা সমষ্টিভূত হবার সুযোগ পায় না বা কোক তৈরি করতে পারে না ; কিন্তু যে সব কয়লা উচ্চাঙ্গের কোক দেয় না, তাদের ক্ষেত্রে বায়ু সরবরাহের প্রয়োজন হয় না।

এর পর ঐ গরম কয়লাকে একটি কিল্‌ন (Kiln) জাতীয় ভাটিতে ফেলে দেওয়া হয়। ঐ কিল্‌নের একটি মুখ একটু উপরের দিকে হেলানো থাকে এই মুখের মাধ্যমে গরম কয়লা কিল্‌নের উদর পূর্ণ করে। এই কিল্‌নগুলি দুটি চোঙার দ্বারা গঠিত। বাইরের চোঙাটি স্থির, কিন্তু ভিতরের চোঙাটি ঘুরতে থাকে। বাইরের চোঙাটির অপর মুখ দুটি ভিতরের চোঙাটির মুখ দুটির সঙ্গে এমন ভাবে জুড়ে দেওয়া হয় যে, উপজাত পদার্থগুলি বাইরে যেতে পারে না। বাইরের ও ভিতরের চোঙার মধ্যে যে স্থান থাকে, সে স্থানে গ্যাস সরবরাহ করে ঐ গ্যাস জালিয়ে তার উত্তাপ থেকে কার্বনাইজারকে ১০৪০ ডিগ্রীতে উত্তপ্ত করা হয়। যখন এই গ্যাস পুড়ে অন্য গ্যাসে পরিণত হয়, তখন তা রোস্টারকে উত্তপ্ত করবার জন্যে ব্যবহৃত হয়। কার্বনাইজার এমন ভাবে হেলানো থাকে যে, উপরের মুখ থেকে কয়লা এসে কার্বনাইজ্‌ড্‌ হয়ে নীচের মুখ দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে। ডিস্কো প্রথায় লো-টেম্পারেচার

কার্বনাইজেসনের ফলে অর্ধ কোক ছাড়া আদি আলকাত্‌রা এবং গ্যাস পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে অ্যামোনিয়া পাওয়া যায় না।

জার্মেনীর বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ফ্রাঞ্জ ফিশার (Franz Fisher) প্রকৃত লো-টেম্পারেচার কার্বনাইজেসন প্রক্রিয়াটি বিশেষভাবে অধ্যয়ন করেন। তিনি এবং তাঁর সহকর্মীরা দেখেন যে, ৪৫০ ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেডে উত্তপ্ত হলে কয়লা কোকে পরিণত হবার প্রথম সোপানে পদার্পণ করে এবং ৫৭৫-৬০০ ডিগ্রীতে কোককরণ প্রথাটি সম্পন্ন হয়ে যায়। এই প্রথায় যে আলকাত্‌রা উৎপন্ন হয়, তার সঙ্গে প্রায় সমান পরিমাণ জল পাওয়া যায়—এটিও তাঁরা লক্ষ্য করেন। আলকাত্‌রার জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই সর্বোচ্চ মাত্রায় গ্যাসও উৎপন্ন হয়। ৬০০ ডিগ্রীতে কিন্তু গ্যাস উৎপাদনের হার কমে আসে। সাধারণত ১০ কিলোগ্র্যাম কয়লা থেকে এই প্রথায় ১/২-৩/৪ কিউবিক মিটার গ্যাস পাওয়া যায়।

হাই ওভেনে (High Ovens) কয়লাকে ১০০০ ডিগ্রীর উপর উত্তপ্ত করবার প্রধান উদ্দেশ্যই হচ্ছে মেটালার্জিক্যাল কোক তৈরি করা। আলকাত্‌রা বা গ্যাসকে বাই-প্রডাক্টস্ (By-Products) বলা হয়। কিন্তু লো-টেম্পারেচারে কার্বনাইজেসনের প্রধান লক্ষ্যই হচ্ছে, মূল্যবান আদি আলকাত্‌রা উৎপন্ন করা। মুলহাইন-রুরের (Mulhein Rurer) থিসেন অ্যাণ্ড কোং (Thyssen & Co.) এই প্রথা চালু করবার উদ্দেশ্যে এক প্রকার রিভল্‌ভিং (Revolving) চুল্লীর প্রচলন করেন। এই প্রকার চুল্লী ২৪ ঘণ্টায় ১০০ টন কয়লার কার্বনাইজেসন করতে পারে। এই পরিমাণ কয়লার হাই-টেম্পারেচারে কার্বনাইজেসন করতে ১০-১২টি ওভেনের প্রয়োজন হয়। উক্ত চুল্লীতে লো-টেম্পারেচারে কয়লার কার্বনাইজেসন করবার ফলে ১ টন কয়লা থেকে ১০০ কিলোগ্র্যাম আদি আলকাত্‌রা, ৩০ কিলোগ্র্যাম মোটর অয়েল, ১৫০ কিউবিক মিটার গ্যাস, যার ক্যালরিফিক ভ্যালিউ ৭০০০ W. E. পাওয়া যায়।

জার্মেনীতে লো-টেম্পারেচারে কয়লাকে কার্বনাইজ করবার জন্যে লুর্গি (Lurgi) চুল্লীরও প্রচলন হয়েছিল। ১৯৩৯ সালে ১৮টি লুর্গি প্ল্যাণ্ট চালু হয়ে দৈনিক প্রায় ৪২০০০ টন কয়লাকে কার্বনাইজ করা হতো।

জিয়ালগোরার ফুয়েল রিসার্চ ইনষ্টিটিউট ছাড়া হায়দরাবাদের রিজিওন্যাল রিসার্চ ইনষ্টিটিউটে লো-টেম্পারেচার কার্বনাইজেসন প্রথা অবলম্বন করে সেমি

বা অর্ধ কোক তৈরি করবার চেষ্টা চলছে। ওখানকার লেবরেটরিতে যে লুর্গি স্পুল গ্যাস লো-টেম্পারেচার কার্বনাইজেসন পাইলট প্ল্যাণ্ট স্থাপিত হয়েছে, তার সাহায্যে ৬৬০৯ টন কোথাগুডেম (Kothagudem) কয়লা থেকে ৪৬৪৩ টন অর্ধ কোক তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। এই অর্ধ কোককে তাঁরা কোলসিট (Kolsit) নাম দিয়েছেন। এটি উক্ত লেবরেটরির ১৯৬২-৬৩ সালের রিপোর্ট থেকে জানা যায়। এর পূর্ব বছরে তাঁরা ৫৪০৬ টন কয়লা থেকে ৩২১৫ টন কোলসিট পেয়েছিলেন। ১৯৬২-৬৩ সালের ৪৬৪৩ টন কোলসিট থেকে ৩৫৫৬ টন গৃহে ব্যবহার্য ইন্ধন হিসাবে বিক্রয় করা হয় এবং প্রায় ৫০০ টন কোলসিট ন্যাশন্যাল মেটালার্জিক্যাল লেবরেটরিতে লো-স্যাফ্ট্ ফার্নেসে এই অর্ধ কোকের সাহায্যে পিগ-আয়রন তৈরি করা সম্ভব কিনা, সে বিষয়ে গবেষণার উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়।

হায়দরাবাদের গবেষণাগারে লো-টেম্পারেচার প্রথায় প্রস্তুত আলকাত্রার অ্যাসিড অংশে কি পাওয়া যায়, তার পরীক্ষা হয়েছে। পরীক্ষার ফলে জানা গেছে যে, তাতে ৩-৫ ডাই ইথাইল ফেনোল (3. 5. Diethyl Phenol), ৩, ৪, ৫ ট্রাইমেথিল ফেনোল (3. 4. 5 Trimethyl phenol), ৪ হাইড্রক্সি হিড্রি ইনডেন (4, Hydroxy bydri indene) এবং ৫ হাইড্রক্সি হিড্রি ইনডেন (5, Hydroxy hydri indene) বর্তমান আছে। হাই বয়েলিং (High boiling) অংশকে ডিষ্টিল করে দেখেছেন যে, প্রায় শতকরা ২০ ভাগ ডাইহিড্রিক ফেনোল পাওয়া যায়।

উক্ত লেবরেটরিতে লো-টেম্পারেচার প্রথায় উদ্ভূত আলকাত্রাকে ২২৫ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড উত্তাপে ডিষ্টিল করবার ফলে যে অংশটি বেরিয়ে আসে, তাথেকে ক্রিয়োজোট ও হার্ড পিচ্ তৈরি করবার চেষ্টা হচ্ছে। ২৩৫ ডিগ্রীতে যে অংশটি ডিষ্টিল্ড্ হয়ে বেরিয়ে আসে, তাকে ক্যাটালিটিক অক্সিডেসন (Catalytic oxidation) করে ডিস্ইনফেক্ট্যাণ্ট (Disinfectant grade) ক্রিয়োজোট তৈরি করে বাজারে সরবরাহ করা হয়েছে।

এছাড়া ওখানে আলকাত্রা ও অর্ধ কোক নিয়ে অনেক প্রকার গবেষণা চলছে।

আদি আলকাত্‌রা

আদি আলকাত্‌রা ও সাধারণ আলকাত্‌রার মধ্যে প্রভেদ এই যে, আদি আলকাত্‌রায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্যারাফিন কণা ভাসতে থাকে, যা সাধারণ আলকাত্‌রায় দেখা যায় না। দ্বিতীয়ত আদি আলকাত্‌রার গন্ধটা কতকটা পচা ডিমের গন্ধের ন্যায়, কিন্তু সাধারণ আলকাত্‌রায় ন্যাপথালিনের গন্ধ পাওয়া যায়। যে আলকাত্‌রায় ন্যাপথালিন পাওয়া যায়, তাকে আদি আলকাত্‌রা বলা চলে না, কারণ আদি আলকাত্‌রাকে ৭০০ ডিগ্রীতে উত্তপ্ত করলে তবে তাথেকে ন্যাপথালিনের উৎপত্তি হয়। আদি আলকাত্‌রায় যে সব হাইড্রোকার্বন পাওয়া যায়, সেগুলি প্যারাফিন হাইড্রোকার্বন, অলিফিন, ন্যাপথিন এবং হাইড্রোঅ্যারোম্যাটিক জাতীয়। সাধারণ আলকাত্‌রায় অধিকাংশ অ্যারোম্যাটিক হাইড্রোকার্বনই পাওয়া যায়।

আলকাত্‌রার কালো রঙের সঙ্গে সকলেই পরিচিত, কিন্তু আদি আলকাত্‌রার রং কতকটা পোর্ট ওয়াইনের ন্যায়। আদি আলকাত্‌রায় প্রায় অর্দ্ধেকটা ফেনোল (Phenol), বাকী অর্দ্ধেকটা হাইড্রোকার্বন অলিফিন ও ন্যাপথিন। পিরিডিন ও অ্যামোনিয়া অতি সামান্য মাত্রায় পাওয়া যায়। আদি আলকাত্‌রার ফেনোল অংশটিকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে পৃথক করে ফরম্যালডিহাইডের সঙ্গে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে নানা প্রকারের ব্যাকেলাইট (Bakelite) জাতীয় রজন (Resin) তৈরি হতে পারে।

আদি আলকাত্‌রার ব্যবহার

মেশিন চালাবার জন্যে ইন্ধন রূপে এটি ব্যবহৃত হতে পারে। দ্বিতীয়ত এই পদার্থটি আলকাত্‌রার ন্যায় দরজা-জানালা রং করবার জন্যেও ব্যবহৃত হতে পারে। তৃতীয়ত একে লুব্রিকেটিং (Lubricating) অয়েল হিসাবে ব্যবহার করা চলে।

আদি আলকাত্‌রার হাইড্রোকার্বন অংশটি ফেনোল অংশ থেকে পৃথক করলে যা পাওয়া যায়, সেটা কতকটা বাকু (Baku) থেকে যে পেট্রোলিয়াম পাওয়া যায়, তারই মত। এটি নানা প্রকার রাসায়নিক পদার্থের মিশ্রণ। একে ডিষ্টিল করলে নিম্নলিখিত অংশগুলি পাওয়া যায় :—

প্রথম অংশ

আদি আলকাত্‌রার হাইড্রোকার্বন অংশটিকে ২০-৬০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে

উত্তপ্ত করলে যা ডিষ্টিল্‌ড হয়ে বেরিয়ে আসে, তাকেই প্রথম অংশ (Fraction) বলা চলে। এই অংশে প্যারাফিন হাইড্রোকার্বনের আধিক্য দেখা যায়। সাধারণত পেণ্টান ও হেক্সান (Pentan and Hexan) জাতীয় এবং এদের নিকটআত্মীয় রাসায়নিক পদার্থগুলিকেও এই অংশে পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় অংশ

৬০-১০০ ডিগ্রী উত্তাপ দিলে যা ডিষ্টিল্‌ড্‌ হয়ে বেরিয়ে আসে, তাকেই দ্বিতীয় অংশ (Fraction) বলা হয়। সাধারণ আলকাত্‌রার এই অংশে (Fraction) বেঞ্জিন (Benzene) পাওয়া যায়। আদি আলকাত্‌রার এই অংশটাতে আমরা কিন্তু বেঞ্জিনের দেখা পাই না। বেঞ্জিনের পরিবর্তে আমরা ন্যাপথেন জাতীয় হাইড্রোকার্বন পাই। এতে ন্যাপথেন ছাড়া অন্যান্য প্যারাফিন হাইড্রোকার্বনও মিশ্রিত থাকে, তবে অধিকাংশ ভাগই যে ন্যাপথেন জাতীয় হাইড্রোকার্বন, তা নিশ্চয় করে বলা চলে।

তৃতীয় অংশ

১০০-১২৫ ডিগ্রীতে উত্তপ্ত করলে যা ডিষ্টিল্‌ড্‌ হয়ে বেরিয়ে আসে, এই অংশে সাধারণ আলকাত্‌রায় টলুয়িন পাওয়া যায়, কিন্তু আদি আলকাত্‌রায় আমরা টলুয়িনের পরিবর্তে টলুয়িন অপেক্ষা উচ্চাঙ্গের হাইড্রোজেন সম্মিলিত পদার্থের দেখা পাই।

চতুর্থ অংশ

১২৫-১৯০ ডিগ্রী উত্তপ্ত করলে যা ডিষ্টিল্‌ড্‌ হয়ে বেরিয়ে আসে, তাও হাইড্রোকার্বনের মিশ্রণ। উপরিউক্ত অংশগুলির ন্যায় এতেও কোন অক্সিজেন বা নাইট্রোজেন বা সালফার নেই। এতে যে সব রাসায়নিক পদার্থ আছে, সেগুলি সবই প্যারাফিন হাইড্রোকার্বন ; কেন না, এখানে কার্বন অংশটা কম এবং হাইড্রোজেনের অংশটা বেশী।

উপরিউক্ত চারটি অংশকে একত্রে বেঞ্জিন (Benzene) বলা চলে। প্রথম তিনটি অংশ একত্র করে হাল্কা এবং শেষেরটিকে ভারী বেঞ্জিন বলা যেতে পারে। ২০-২০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে উত্তপ্ত করলে যে অংশটি ডিষ্টিল্‌ড্‌ হয়ে বেরিয়ে আসে তাকে বেঞ্জিন বলা চলে, উপরে সে কথা বলা হয়েছে। একে পিউরিফাই করলে জলের ন্যায় স্বচ্ছ, বায়ু ও আলোর দ্বারা আক্রান্ত হয় না, এমন একটি

তেল পাওয়া যায়। উপরিউক্ত চার অংশ এবং একে পোড়ালে ১১০০০ ক্যালরি উত্তাপ পাওয়া যায়।

আদি আলকাত্‌রার হাইড্রোকার্বন অংশটির যে ভাগটি (Fraction) ১৫০-২০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে্‌ ডিষ্টিল্‌ড্‌ হয়ে বেরিয়ে আসে, তাকে সোলার অয়েল বলা চলে। এই সোলার অয়েল কিন্তু গ্যাস ফ্যাক্টরির আলকাত্‌রাকে ১৫০-২০০ ডিগ্রীতে উত্তাপ দিয়ে যে সোলার অয়েল পাওয়া যায়, তাথেকে ভিন্ন। এটা কতকটা ব্রাউন কোল থেকে উক্ত প্রথায় যে সোলার অয়েল পাওয়া যায়, তার ন্যায়। এই সোলার অয়েলকে কেরোসিন তেলের ন্যায় ল্যাম্পে জ্বালিয়ে আলো পাওয়া যেতে পারে।

আদি আলকাত্‌রার হাইড্রোকার্বন অংশের যে অংশটি (Fraction) ২২০-২৫০ ডিগ্রীতে ডিষ্টিল্‌ড্‌ হয়ে বেরিয়ে আসে, তাকে পলিশিং অয়েল (Polishing oil) বলা চলে। ব্রাউন কোলের আলকাত্‌রা থেকে ঠিক এই ভাবে এই প্রকার পলিশিং অয়েল পাওয়া যায়।

আদি আলকাত্‌রার হাইড্রোকার্বনের যে অংশটি ২৫০-৩০০ বা ৩২০ ডিগ্রীতে ডিষ্টিল্‌ড্‌ হয়ে বেরিয়ে আসে, তাকে হল্‌দে তেল (Yellow oil), লাল তেল (Red oil) বা গ্যাস তেল (Gas oil) বলা হয়। ব্রাউন কোলের আলকাত্‌রা থেকেও এই প্রকার নানা রকম তেল পাওয়া যায়।

আদি আলকাত্‌রার হাইড্রোকার্বন অংশের যে ভাগটি (Fraction) ২০০-৩০০° ডিগ্রীতে ডিষ্টিল্‌ড্‌ হয়ে বেরিয়ে আসে, তাতে মাত্র ১০ ভাগ তরল প্যারাফিন থাকে, বাকী ৯০ ভাগ ন্যাপথেন, অলিফিন, ডাই-অলিফিন এবং হাইড্রোঅ্যারোম্যাটিক হাইড্রোকার্বনের মিশ্রণ।

আদি আলকাত্‌রার হাইড্রোকার্বন অংশের যে ভাগটি ৩০০ ডিগ্রীর উত্তাপের পর বাকী থাকে, তাকে ৩০০ ডিগ্রীর উপরে উত্তপ্ত করলে সেটি অন্য পদার্থে পরিবর্তিত না হয়ে ডিষ্টিল্‌ড্‌ হতে পারে না। সে জন্যে একে হয় ভ্যাকুয়াম ডিষ্টিলেসন অথবা অতিরিক্ত উত্তপ্ত (Super heated) জলের বাষ্পের সাহায্যে ডিষ্টিল করতে হয়। এইভাবে ডিষ্টিল করলে এই অংশ থেকে একদিকে যেমন শক্ত প্যারাফিন পাওয়া যায়, অপর দিকে তেমনি এক প্রকার গাঢ় তেল পাওয়া যায়। উত্তাপের মাত্রা যত উচ্চ হয়, উক্ত তেলের গাঢ়তাও (Viscosity) সেই পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। এই তেলটি লুব্রিকেটিং অয়েলের ধরনের, কাজেই

একে উক্ত উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যেতে পারে। অতিরিক্ত উত্তপ্ত (Super heated) জলীয় বাষ্পের সাহায্যে ডিষ্টিলেশন প্রক্রিয়া চালিয়া সমস্ত অংশটিকেই ডিষ্টিল করা চলে, ডিষ্টিলেশন পাত্রেও (Flask) কিছুই শেষ থেকে যায় না। কিন্তু ভ্যাকুয়াম ডিষ্টিলেসন করলে শেষে ডিষ্টিলেসন পাত্রে (Flask) একটি পদার্থ অবশিষ্ট থেকে যায়, যাকে পিচ্‌ বলা হয়।

আদি আলকাত্‌রার ন্যাপথালিন (Napthalin) ও অ্যানথ্রাসিন (Anthracene) নেই। কাজেই একে এক প্রকার পেট্রোল বলা চলে।

আদি আলকাত্‌রার ফেনোল অংশ

আদি আলকাত্‌রার ফেনোল অংশটি উত্তপ্ত করলে ১৮০ ডিগ্রী অবধি উত্তাপে কোন কিছুই ডিস্টিল হয়ে আসে না। ১৮০-৩০০° ডিগ্রী পর্যন্ত উত্তাপে ক্রমাগত কোন না কোন ফেনোল ডিস্টিল হয়ে বেরিয়ে আসে। ফেনোল অংশে কিন্তু কার্বলিক অ্যাসিড নেই বললেই চলে। আদি আলকাত্‌রার ফেনোল অংশটিকে অত্যধিক উত্তপ্ত করে ক্র্যাক্‌ করলে অবশ্য অনেকখানি কার্বলিক অ্যাসিড পাওয়া যেতে পারে; অর্থাৎ সমস্ত আলকাতারার শতকরা একভাগ কার্বলিক অ্যাসিডে পরিণত করা যায়।

এই ফেনোল অংশে সমস্ত আদি আলকাতারার ১-২% ক্রেজোল পাওয়া যায়। ক্রেজোলের মধ্যে অর্থোক্রেজোলের ভাগই বেশী। প্যারা ক্রেজোল অতি সামান্য মাত্রায় পাওয়া যায়।

ফেনোল অংশে ক্রেজোল অপেক্ষা জাইলেনোল অধিক মাত্রায় পাওয়া যায়।

উপরিউক্ত ফেনোলগুলি ছাড়া Benz calechin নামক ফেনোলও আদি আলকাতারার এই অংশে পাওয়া গেছে।

বাকী অংশটিতে উচ্চাঙ্গের (Higher) ফেনোল আছে। এগুলির কিছু অংশ থেকে এক প্রকার গাঢ় পদার্থ পাওয়া যায়, যাকে ভিসকোজ (Viscose) ফেনোল বলা যেতে পারে, আর বাকী অংশটাকে রেজিনাস (Resioous) ফেনোল বলা চলে। আদি আলকাত্‌রাকে আমাদের ব্যবহারিক কাজে লাগাবার জন্যে দুটি বিভিন্ন উপায়ে একে ডিস্টিল করা যেতে পারে।

একে অতি উত্তপ্ত (Super heated) জলীয় বাষ্পের সঙ্গে মিলিয়ে ডিস্টিল

করা যেতে পারে। ১০০ ডিগ্রীতে উত্তপ্ত জলীয় বাষ্পের সঙ্গে ডিষ্টিল করলে হাল্‌কা বেঞ্জিন বেরিয়ে আসে। এই ধরনের বেঞ্জিন বেরিয়ে আসবার পর আর কিছুই আসে না। পরে একে তাড়াতাড়ি ২০০ ডিগ্রী অবধি উত্তপ্ত করলেও কোন ফেনোল অংশ এর সঙ্গে মিলিত হয়ে আসে না। কাজেই ২০০ ডিগ্রী পর্যন্ত যা আসে, তাকে বেঞ্জিন বলা চলে। এর পর অতি উত্তপ্ত জলীয় বাষ্পের সাহায্যে ডিষ্টিল করা যেতে পারে। এর ফলে যখন টেম্পারেচার ১৮০-২০০ ডিগ্রী অবধি পৌছে, তখন পর্যন্ত যা পাওয়া যায়, সেটা উচ্চাঙ্গের হাইড্রোকার্বনের সঙ্গে কিছু ফেনোল মিশ্রিত পদার্থ। এর চেয়ে বেশী উত্তপ্ত করলে এক প্রকার ভিস্‌কোজ অয়েল পাওয়া যায়। এর পর আরও উত্তপ্ত করলে কাদার ন্যায় একটি পদার্থ পাওয়া যায়, যা থেকে সূতার ন্যায় তার টানা যেতে পারে।

উপরিউক্ত ভিস্‌কোজ অয়েলটিকে লুব্রিকেটিং অয়েলে পরিণত করতে হলে এবং তার ফ্লেম পয়েন্ট (Flame point) উচ্চ করবার জন্যে আংশিক ডিষ্টিলেশন (Fractional Distillation) করে সেই সব অংশগুলিকে বাদ দেওয়া হয়। এগুলির বয়েলিং পয়েন্ট (Boiling point) কম এবং এরা ফ্লেম পয়েন্টকে নীচু করে দেয়।

এছাড়া উক্ত ভিস্‌কোজ অয়েলে অনেক পরিমাণে প্যারাফিন বর্তমান থাকে। এই প্যারাফিন অংশটিকে ফিল্টার করে ফিল্টার প্রেসের সাহায্যে পৃথক করা যেতে পারে কিম্বা সেন্ট্রিফিউগ্যাল যন্ত্রের সাহায্যেও পৃথক করা যেতে পারে, যাতে প্যারাফিন গলে যায় না ; যেমন—অ্যাসিটোন (Acetone), অথচ কোন অংশটি ডাইলিউটেড্ হয়ে যায়। এই অবস্থায় ফিল্টার করলে অতি সহজেই প্যারাফিন অংশটিকে পৃথক করা যায়। এই প্যারাফিন থেকে বাতি তৈরি করা হয়। উচ্চ ধরনের লুব্রিকেটিং অয়েল তৈরি করবার জন্যে এথেকে ফেনোল্ অংশটিকে বাদ দেবার দরকার হয় না। অনেকে মনে করতে পারেন যে, ফেনোল অংশটি অ্যাসিড, কাজেই এটি মেশিনের কল-কব্জার ক্ষতি করতে পারে। কিন্তু দেখা গেছে যে, বাস্তবিক পক্ষে এই ফেনোলগুলি অতি সামান্য মাত্রায় অ্যাসিড, কাজেই এর দ্বারা কল-কব্জার কোন ক্ষতিই হয় না। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্যে ফেনোল অংশটিকে বাদ দেওয়া বিশেষ প্রয়োজনীয় মনে হতে পারে। রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে এরূপ হওয়া অসম্ভব

নয়। এইরূপ ফেনোলহীন লুব্রিকেটিং অয়েল যা তৈরি করা হয়, তা স্বচ্ছ সোনালী রঙের এক প্রকার তেল।

এই প্রকার ডিষ্টিলেসনের শেষ অঙ্কে যা পাওয়া যায়, তা এক প্রকার লাল রঙের রজন। এটি কতকটা লাক্ষার (Lac) ন্যায়। লাক্ষাকে যে সব ঔদ্যোগিক কাজে লাগানো হয়, একেও সেই সব কাজে লাগানো যেতে পারে।

আদি আলকাত্‌রাকে অতি উত্তপ্ত (Super heated) জলীয় বাষ্পের সঙ্গে ডিষ্টিল করলে নিম্নলিখিত অংশগুলি পাওয়া যায়—

১৫০ ডিগ্রী অবধি বয়েলিং (Boiling)		
বেঞ্জিন	...	১০
উত্তাপ দেবার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যেতে পারে,		
ফেনোল সমন্বিত এমন তেল	...	৩০%
ফেনোল সমন্বিত লুব্রিকেটিং তেল	...	৩৫%
প্যারাফিন	...	১-২%
রজন (Resin)	...	২৩%

আদি আলকাত্‌রাকে কিছুর সাহায্যে ব্যতিরেকে ডিস্টিল করলে নিম্নলিখিত অংশগুলি পাওয়া যায়—

বেঞ্জিন এবং জ্বালানী তেল, যার বয়েলিং রেঞ্জ (Boiling range) ২২৫ ডিগ্রী অবধি।		২৮%
উত্তাপ দেবার জন্যে তেল, যার বয়েলিং রেঞ্জ ৩০০ ডিগ্রী অবধি।	...	২৪%
ফেনোল সমন্বিত ভিস্‌কোজ তেল (এতে প্যারাফিন থাকে)	...	২৪%
পিচ	...	২৪%

জার্মেনীতে আদি আলকাত্‌রা থেকে নিম্নলিখিত ঔদ্যোগিক মাল তৈরি হয়।

হাল্‌কা তেল (Light oil)	...	১৮-২৫%
স্পিণ্ডেল অয়েল (Spindle oil)	...	১৩-১৫%
মেশিন অয়েল (Machine oil)	...	২০-২৫%
রজন	...	৫-৮%
পিচ্‌	...	২৫-৩৫%

হাইড্রোজেন এবং ৩০-৪০ মিথেন গ্যাস থাকে ; কাজেই ইন্ধন হিসাবে এগুলি অতি মূল্যবান।

অ্যামোনিয়া (Ammonia)

হাই-টেম্পারেচার কার্বনাইজেসনের ফলে কয়লা থেকে বেশ খানিকটা অ্যামোনিয়া পাওয়া যায়, সে কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। যে সব কারখানায় এই প্রথায় কয়লাকে কার্বনাইজ করা হয়, সেখানে গ্যাস এবং আলকাত্‌রার জলীয় অংশ থেকে অ্যামোনিয়া উদ্ধার করা হয়। এসব কথা পূর্বেই বিশদভাবে বলা হয়েছে। লো-টেম্পারেচার কার্বনাইজেসনের ফলে কিন্তু কয়লা থেকে অ্যামোনিয়া পাওয়া যায় না বললেও ভুল হবে না, কারণ কয়লার নাইট্রোজেন অংশটি ৬০০ ডিগ্রী বা তার চেয়ে বেশী ডিগ্রী উত্তাপে তৈরি হয়। হাই-টেম্পারেচার কার্বনাইজেসনের ফলে কয়লার শতকরা প্রায় ১৫ ভাগ অ্যামোনিয়া পাওয়া যায়, কিন্তু লো-টেম্পারেচারের বেলায় শতকরা মাত্র দু-ভাগ পাওয়া যায়।

জিয়ালগোরার ফুয়েল রিসার্চ ইনষ্টিটিউট, জামবাদ-বোউলা (Jambad-Bowla) এবং আপার কাজোরা সিমের (Upper-Kajora) নন-কেকিং (Non-caking) কয়লা, রাণীগঞ্জের সামান্য মাত্রায় কেকিং (Weakly caking) কয়লা ও কেকিং কয়লা নিয়ে নানা প্রকার যন্ত্রে লো-টেম্পারেচারে কার্বনাইজ করে নিম্নলিখিত ফল পেয়েছেন। জামবাদ-বোউলা ও কাংজারিয়ার নন-কেকিং কোলের কেকিং ইণ্ডেক্স (Caking index) ৩-এর চেয়ে কম।

কয়লার বিশ্লেষণ ফল।

জলীয় অংশ (Moisture)	৫·৩-৬·৩%
ছাই (Ash)	১৪·১-১৮·৫%
উদ্বায়ী অংশ (V. M.)	৩৪·৮-৩৬·১%
স্থায়ী কার্বন অংশ (F. C.)	৪১·৪-৪৩·৫%
ক্যালরিফিক ভ্যালিউ (শুষ্ক অবস্থায়)	১০৩৯০-১১০১৫ বি. টি ইউ/পাউণ্ড

লো-টেম্পারেচার কার্বনাইজেসনের ফলে ১ টন উপরিউক্ত কয়লা থেকে যে

হাল্কা তেল থেকে জলীয় অংশ বাদ দিলে যে তেল পাওয়া যায়, তা ডিজেল মোটর চালাবার পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট তেল বলে গণ্য হয়েছে।

স্পিণ্ডেল অয়েল কিছুটা রজন মিশ্রিত থাকে। এটি রেলগাড়ীর ইঞ্জিন চালাবার জন্যে বিশেষ উপযুক্ত।

রজন ও পিচ্ কিভাবে ব্যবহৃত হয়, তা পূর্বেই বলা হয়েছে।

হাফ কোক

লো-টেম্পারেচার কার্বনাইজেসন প্রথায় উদ্ভূত হাফ কোক সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলা দরকার। এই পদার্থটি গৃহের উনুনে ইন্ধন হিসাবে অতি উত্তম। প্রথমত জ্বালবার সময় এথেকে ধোঁয়া নির্গত হয় না এবং অতি সহজেই জ্বলে ওঠে। এছাড়া এথেকে লেলিহান জিহ্বার ন্যায় অগ্নিশিখা উত্থিত হয়।

অনেকে এই হাফ কোককে বিক্রেট করবার উপদেশ দেন, কিন্তু বিক্রেট করবার জন্যে এতে যে সব বাইণ্ডিং পদার্থের মিশ্রণ করতে হয়, যেমন পিচ্ প্রভৃতি, তারা এই ধূম্রবিহীন হাফ কোককে আবার ধূম্রযুক্ত করে। ধোঁয়া হলে গৃহিণীরা একে কেন ব্যবহার করবেন? সহরের আবহাওয়াকে ধূম্রমুক্ত করাই বৈজ্ঞানিকদের উদ্দেশ্য।

হাফ কোকে কোলের উদ্বায়ী পদার্থের প্রায় শতকরা পঞ্চাশ ভাগ বর্তমান থাকে, কাজেই তা সহজেই জ্বলে ওঠে। তাছাড়া হাফ কোকে উদ্বায়ী পদার্থ ও নাইট্রোজেনের অংশ থাকায় একে হাই-টেম্পারেচারে উত্তপ্ত করে ঐ উদ্বায়ী পদার্থগুলি ও অ্যামোনিয়া পাওয়া যেতে পারে। হাফ কোক থেকে প্রতি পাউণ্ডে ৮০০০ ক্যালরি উত্তাপ পাওয়া সম্ভব। কোক থেকে এর চেয়ে অধিক উত্তাপ পাওয়া যায় না।

গ্যাস

লো-টেম্পারেচার কার্বনাইজেসনের ফলে যে গ্যাস পাওয়া যায়, সেই গ্যাস থেকে ৮৫০০-৯০০০ ক্যালরি উত্তাপ পাওয়া যায়। প্রত্যেক কিলোগ্র্যাম কয়লা থেকে এই প্রথায় প্রায় ৫০-৭৫ লিটার গ্যাস পাওয়া যায়। হাই-টেম্পারেচার কার্বনাইজেসনের ফলে কিলোগ্র্যাম প্রতি যে পরিমাণ গ্যাস পাওয়া যায়, তা এর চেয়ে অনেক বেশী। এই গ্যাসে সাধারণত ৩৫-৫০

পরিমাণ অর্ধ কোক ও বাই-প্রোডাক্ট পেয়েছেন নিম্নে তার হিসাব দেওয়া হলো—

	গ্রেকিং যন্ত্রে ৬০০°	ফিশার যন্ত্রে ৫৫০°	ইলেকট্রিক ওভেনে ৬৫০°
অর্ধকোক—(হন্দর)	১৪'৩-১৪'৭	১৪'৩-১৪'৯	১৩'৯-১৪'৫
আলকাত্‌রা (গ্যালন)	২৬'০-২৯'১	২৩'১-২৫'৯	১১'২-১৪'৮
লিকার (গ্যালন)	১৬'৪-১৭'০	১১'০-১৪'৩	১৯'৭-২০'৮
গ্যাস (কিবিক ফিউ)	৩৩০০-৩৫১৫	২৭৪০-২৯২৩	৫৯৯০-৬০০০

রাণীগঞ্জের নন-কেকিং কয়লা সামান্য মাত্রায় কেকিং কয়লা ও কেকিং কয়লা থেকে নিম্নলিখিত ফল পাওয়া গেছে—

	নন-কেকিং (কেকিং ইণ্ডেক্স ৫ থেকে কম)	সামান্য মাত্রায় কেকিং (কেকিং ইণ্ডেক্স ৬-১০)	কেকিং (কেকিং ইণ্ডেক্স ১০-এর চেয়ে বেশী)
কয়লার বিশ্লেষণ ফল			
জলীর অংশ	৬'০-৬'৯	৩'৪-৫'৩	২'৪-২'৭
ছাই	১৭'২-২৫'৯	১৪'৮-২৫'১	১৫'২-২২'৬
উদ্বায়ী অংশ	৩১'২-৩২'০	৩০'৮-৩৬.০	৩৩'০-৩৪'২
স্থায়ী কার্বন অংশ	৪০'৭-৪৪'৮	৪০'৭-৪৪'৯	৪১'৭-৪৭'৫
ক্যালরিফিক ভ্যালিউ	১০১৭০-১০৭৮০,	১০২৫০-১১৫৯০	১০৯৫০-১২০৪০ বি. টি. ইউ/পাউণ্ড

লো-টেম্পারেচার কার্বনাইজেসনের ফলে ১ টন হিসাবে উপরিউক্ত কয়লা থেকে যে পরিমাণ অর্ধ কোক ও অন্যান্য বাই-প্রোডাক্ট পাওয়া গেছে, নিম্নে তার হিসাব দেওয়া হলো—

নন-কেকিং		সামান্য কেকিং		কেকিং	
গ্রেকিং যন্ত্রে (৬০০°)	ফিশার যন্ত্রে (৫৫০°)	গ্রেকিং যন্ত্রে (৬০০°)	ফিশার যন্ত্রে (৫৫০°)	গ্রেকিং যন্ত্রে (৬০০°)	ফিশার যন্ত্রে (৫৫০°)

	নন-কেকিং		সামান্য কেকিং		কেকিং	
অর্ধকোক	১৫·০	১৪·০	১৪·২	১৪·৮	১৪·৬	১৪·৮
আলকাত্‌রা (গ্যালন)	২২·৬	২০·৪	২৪·২	২৩·১	২৭·৫	২৭·৩
লিকার (গ্যালন)	৯·৪	১১·২	১২·৫	১১·২	১০·৫	৯·২
গ্যাস (কিউবিক ফিট)	৩০৩৫	২৫৬০	৩০৬৫	২৬১০	৩৪০০	২৫৭০

বি. টি. ইউ/পাউণ্ড

জামবাদ-বোউলা সিমের কয়লাকে লো-টেম্পারেচারে কার্বনাইজ করবার ফলে যে আলকাত্‌রা ও লিকার পাওয়া গেছে, তার বিশ্লেষণ ফল দেওয়া হলো—

আলকাত্‌রার বিশ্লেষণ

স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি	০·৯৯২
টলুয়িন গলে না, এমন অংশ	০·৬৪২%
পিচ্‌	২১·৪০০%
টার অ্যাসিড	২৫·৭%
ক্যালরিফিক ভ্যালিউ	১৬৭৫০ বি. টি. ইউ/পাউণ্ড

ফললিকারের বিশ্লেষণ ফল

অ্যামোনিয়া	৭·৭
ফেনোল	৪·০

লেখক ১৯২০-১৯২৫ সালে নানা প্রকার ভারতীয় কয়লা নিয়ে লো-টেম্পারেচারে কার্বনাইজ করে যে ফল পেয়েছিলেন, তা তাঁর লাইপজিগ বিশ্ববিদ্যালয়ের পি-এইচ. ডি. থিসিসে লিপিবদ্ধ করেছেন। মূলত তাঁর গবেষণার ফল আধুনিক গবেষণার ফল থেকে বিশেষ পৃথক নয়।

কয়লার হাইড্রোজেনেসন (Hydrogenation of Coal)

হাইড্রোজেন মলিকিউলের (অণুর) সঙ্গে কোন পদার্থের রাসায়নিক প্রক্রিয়াকে আমরা হাইড্রোজেনেসন বলে থাকি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অর্গানিক (Organic) পদার্থের সঙ্গে হাইড্রোজেনের এই রাসায়নিক প্রক্রিয়া ঘটিয়ে দেওয়া হয়। হাইড্রোজেন অর্গ্যানিক পদার্থের উপর নানাভাবে কাজ করতে পারে; যেমন—অর্গ্যানিক পদার্থের কার্বন কার্বনের ডবল বাঁধনকে (Boud)

শিথিল করে আপনার স্থান করে নেয়, অথবা নাইট্রো বা কার্বনিল (Nitro এবং Carbonyl) গ্রুপের সঙ্গে মিলিত হয়ে ঐগুলিকে হাইড্রোজেনযুক্ত করে। কার্বন ডবল বাঁধন ভেঙে দিয়ে ছোট ছোট অংশ তৈরী করে তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। শেষের পন্থাটিকে ডেস্ট্রাক্টিভ হাইড্রোজেনেসন (Destructive Hydrogenation) বলা হয়।

কার্বন-কার্বন ডবল বন্ধন ভেঙে তার স্থান হাইড্রোজেনের দ্বারা পূর্ণ করে নেওয়াটা আমাদের ঔদ্যোগিক জীবনে বিশেষ স্থান পেয়েছে। ডাল্‌ডা, বনস্পতি প্রভৃতি ঘিগুলি এই রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফল। গত মহাযুদ্ধের সময় Franz Fisher ও Tropscli কার্বন মনোক্সাইডকে (Carbon monoxide) হাইড্রোজেনেসন করে নানা প্রকার হাইড্রোকার্বন (Hydro-carbon) তৈরি করেছিলেন। কার্বন-কার্বন ডবল বন্ধনের স্থানে হাইড্রোজেন জুড়ে দিয়ে রাসায়নিকেরা গত মহাযুদ্ধের সময় বায়ু বিমানের ইন্ধন (Aviation gasoline) তৈরি করেছিলেন। নাইলোন তৈরীর জন্যে নিট্রিল গ্রুপকে, যথা—CN-কেও হাইড্রোজেনযুক্ত করা হয়।

১৮৯৭ সালে Sabtiar ও Senderens নামক দুই জন বৈজ্ঞানিক দেখান যে, নিটেল ক্যাটালিষ্টের (Nickel Catalyst) সাহায্যে কার্বনের ডবল বন্ধন ভেঙে তার স্থানে হাইড্রোজেন যুক্ত করা যায়।

এই দুই বৈজ্ঞানিকের আবিষ্কারের ভিত্তিতে আজ হাইড্রোজেনেসন প্রথায় অনেক ঔদ্যোগিক পদার্থ তৈরি করা হচ্ছে। কয়লার বেলায় Destructive hydrogenation করা হয়।

১৯১১ সালে বার্জিয়াস (Bergius) নামক জার্মান রাসায়নিক সর্বপ্রথম কয়লার হাইড্রোজেনেসন করেন। ১৯১৩-১৪ সালে তিনি তাঁর আবিষ্কৃত প্রথাটির জন্যে পেটেণ্ট নিয়েছিলেন। ১৯২৫ সালে মলিবডিনাম ক্যাপালিষ্ট (Molybdenum catalyst) ব্যবহার করে I. G. Farben কোম্পানী জার্মেনীর লয়না (Loyna) নামক স্থানে ব্রাউন কয়লার (Brown coal) হাইড্রোজেনেসন করেন। ১৯৩৫ সালে Imperial chemical Industry তাঁদের Billingham কারখানায় বিটুমিনাস কয়লার হাইড্রোজেনেসন করেন। এঁরা টিনঅক্সালেট-অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড (Tinoxalate-ammonium chloride) ক্যাটালিষ্ট ব্যবহার করেন। কয়লার হাইড্রোজেনেসন করবার জন্যে প্রথম প্রথম ২০০-

৩০০ অ্যাটমস্ফিয়ার চাপ ব্যবহার করা হয়েছিল। পরে জার্মেনীর কারখানা-গুলিতে ৭০০ অ্যাটমস্ফিয়ারের চাপ ব্যবহৃত হয়।

কয়লা বা আলকাত্রার ন্যায় পদার্থ, যাদের মলিকিউলের পরিমাণ অতি উচ্চ হারের—তাদের হাইড্রোজেনেসন করতে হলে সেগুলিকে দুটি অবস্থায় রাসায়নিক প্রক্রিয়ার অন্তর্গত করা হয়। প্রথম অবস্থাটিকে তরল অবস্থায় রাসায়নিক প্রক্রিয়া (Liquid phase hydrogenation) বলা হয়। এর জন্যে ক্যাটালিষ্টকে অতি ক্ষুদ্রাংশে (Finely devided) এবং অল্প মাত্রায় (Small concentration) ব্যবহার করতে হয়। এই রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে এক প্রকার তেল পাওয়া যায়, যাকে মিডল্ অয়েল (Middle oil) বলা হয়। পরে Vapour phase-এ এর হাইড্রোজেনেসন করলে এথেকে বিমান চালাবার উপযোগী গ্যাসোলিন (Gasoline) পাওয়া যায়।

কয়লার হাইড্রোজেনেসন করবার জন্যে একে প্রথমত শুষ্ক করে নিতে হয়। এর পর একে গুঁড়া করে রিসাইকেল অয়েলের (Recycle oil) [যা রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে ভবিষ্যতে উক্ত প্ল্যাণ্টে (Plant) উৎপন্ন হয়] সঙ্গে মিশিয়ে এক প্রকার 'কয়লা তেলের' পেস্ট (Paste) তৈরি করা হয়। তরল অবস্থার হাইড্রোজেনেসনে এরই ব্যবহার হয়। তরল অবস্থার হাইড্রোজেনেসনের জন্যে যে রিয়্যাক্টরের ব্যবহার হয়, তার টেম্পারেচার সাধারণতঃ ৪৮০-৪৯০ ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড। ৪৬০ ডিগ্রী টেম্পারেচার ব্যবহার করলে প্রক্রিয়াটি অতি মন্থর গতিতে চলতে থাকে এবং ৪৯০-এর উপর গরম করলে প্রক্রিয়াটি অতি দ্রুত চলে। কাজেই ৪৮০-৪৯০ ডিগ্রিতেই হাইড্রোজেনেসন করা শ্রেয়ঃ। সাধারণত এক ঘণ্টাতেই প্রক্রিয়াটি সমাপ্ত হয়.। এর ফলে যে মিডল্ অয়েল (Middle oil) উৎপন্ন হয়, তাকে বাষ্পীয় অবস্থায় (Vapour phase) হাইড্রোজেনেসন করা হয়। এর ফলে গ্যাসোলিন (Gasoline) পাওয়া যায়। বাষ্পীয় অবস্থায় হাইড্রোজেনেসন করবার জন্যে একবার বা দুবার (Single or double step) করতে হয়। যে সব প্ল্যাণ্টে (Plant) ৩০০ অ্যাটমস্ফিয়ার চাপ ব্যবহার করা হয়, সেখানে দুবারে (Two step) কাজ সমাধা করা হয়। কিন্তু যেখানে ৭০০ অ্যাটমস্ফিয়ার চাপ ব্যবহার করা হয়, সেখানে একবারেই কার্য সমাধা হয়। মোটর গাড়ী চালু করবার উপযোগী প্রতি টন গ্যাসোলিন তৈরির জন্যে

কি পরিমাণ কয়লা ও কি পরিমাণ হাইড্রোজেন প্রয়োজন হয়, তা নিম্নে দেখানো হয়েছে।

	প্রতি টন গ্যাসোলিনের জন্যে জল ও ছাইবিহীন কয়লার পরিমাণ	প্রতি টন গ্যাসো-লিনের জন্যে হাইড্রোজেনের পরিমাণ
বিটুমিনাস কয়লা ১০০ অ্যাটমস্ফিয়ার চাপে	১·৬৩	০·২৩৬

পূর্বে বলা হয়েছে যে, কয়লার জাতিভেদ আছে। সব জাতের কয়লার হাইড্রোজেনেসন করা যায় না। নিকৃষ্ট জাতীয় কয়লা, যথা—লিগ্‌নাইট বা ব্রাউন কোলের সহজেই হাইড্রোজেনেসন করা যায়। বিটুমিনাস কয়লাকেও হাইড্রোজেনেসন করা যায়, কিন্তু অত সহজে নয়। অ্যান্‌থ্রাসাইট কয়লাকে হাইড্রোজেনেসন করা চলে না বললে ভুল হবে না। সাধারণত যে সব কয়লার কার্বনের অংশ শতকরা ৮৫-এর নীচে, তারাই হাইড্রোজেনেসনের উপযোগী। অবশ্য এই নিয়মের যে ব্যতিক্রম না হয়, তা বলা চলে না।

যে সব কয়লায় ফুসেন (Fusain) আছে, তাদের ফুসেন অংশকে হাইড্রোজেনেসন করা যায় না, কাজেই যে সব কয়লাতে ফুসেনের আধিক্য আছে, তারা হাইড্রোজেনেসনের উপযোগী নয়।

কয়লার হাইড্রোজেনেসন করে আমরা নানা প্রকার জালানী তেল পেতে পারি। এর ফলে মোটর গাড়ী চালাবার জন্যে গ্যাসোলিন, ডিজেল অয়েল বা বায়ুযান চালাবার উপযুক্ত তেল পাওয়া যেতে পারে। এছাড়া এই প্রক্রিয়ার ফলে আমরা ফেনোল, ক্রোজেল, জাইলেনোল, কার্বাজোল, ইন্‌ডোল, পাইরেন, ফেনান্‌থ্রেন, করোনেন প্রভৃতি রাসায়নিক পদার্থগুলি পেতে পারি।

আলকাত্‌রা ডিস্টিলেসন (Distillation)

আলকাত্‌রা বলতে সাধারণত আমরা হাই-টেম্পারেচার কার্বনাইজেসনের ফলে বিটুমিনাস কয়লা থেকে যে আলকাত্‌রা পাই তাকেই বুঝি, কিন্তু আদি আলকাত্‌রা অর্থাৎ যা লো-টেম্পারেচার কার্বনাইজেসনের ফলে উৎপন্ন হয়,

তাকেও বুঝতে হবে। এছাড়া গ্যাস তৈরির সময় শায়িত (Hrizontal) রিটর্টে এবং দণ্ডায়মান (Vertical) রিটর্টে যে আলকাত্‌রা পাওয়া যায় তাকেও বুঝতে হবে। হাই ও লো-টেম্পারেচার কার্বনাইজেসন প্রসঙ্গে আমরা আলকাত্‌রা ডিষ্টিলেসনের কথা যেভাবে আলোচনা করেছি, তা বৃহৎ উদ্যোগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ছোটখাটো উদ্যোগের মারফৎ আলকাত্‌রা ডিষ্টিলেসন প্রক্রিয়াটিও সাধিত হতে পারে। কাজেই এই সব ক্ষেত্রে কিভাবে আলকাত্‌রা ডিষ্টিলেসন করা হয়, তার আলোচনা দরকার।

ইউরোপে এর জন্যে বিরত প্রথায় অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ আলকাত্‌রাকে প্রয়োজনানুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে একটি গোলতলাযুক্ত দণ্ডায়মান ভাটিতে ডিষ্টিল করবার প্রথাই প্রচলিত ছিল। ইংরেজিতে এইরূপ পাত্রকে ব্যাচ ষ্টিলস্ (Batch stills) বলা হয়। এছাড়া অবিরত প্রথায় (Continuous) ডিষ্টিলেসন চালু রাখা যায়, এরূপ পাত্রেরও ব্যবহার হয়। এজন্যে নানা ধরনের অবিরত ষ্টিলসের ব্যবহার হয়েছে ; যথা—এক বা বহু ট্যাঙ্ক সমন্বিত ষ্টিলস্ (Single and multiple tank), টিউব বা নল স্টিলস্ Tube stills), সিঙ্গল পাস, সিঙ্গল ফ্ল্যাশ টিউব স্টিলস্ (Single pass, Single flash tubes stills) সিঙ্গল পাস, ডবল ফ্ল্যাশ (Single pass, double flash) টিউব স্টিলস্, ডবল ফ্ল্যাশ, ডবল পাস (Double pass, Double flash) টিউব স্টিলস্, রি-সার্কুলেটিং (Recirculating) টিউব স্টিলস্, কম্বাইন্‌ড্ (Combined) টিউব এবং ট্যাঙ্ক স্টিলস্। ব্যাচ (Batch) প্রথায় আলকাত্‌রা ডিষ্টিলেসন করা ইউরোপে, বিশেষত জার্মেনীতে প্রচলিত ছিল। ওখানকার রুটগার্স (Rutgers) কোম্পানীর কারখানা ১৯২৩-২৫ সালে আলকাত্‌রা ডিস্টিলেসনের জন্যে বিখ্যাত। জার্মেনীতে যে স্টিলের ব্যবহার ছিল, সেগুলিতে প্রত্যেক ব্যাচে ৩০০০ থেকে :১০০০ গ্যালন আলকাত্‌রাকে ডিস্টিল করা হতো। রুটগার্স কোম্পানীর কারখানায় ঐ ষ্টিলগুলির সঙ্গে ভ্যাকুয়াম পাম্প (Vacuum pump) ব্যবহার করে (পারদের ৬০০-৬৫০ মিলিমিটার চাপে) ডিস্টিল করাহতো। ১৯২০ সালে জার্মেনীর কপার্স কোম্পানী (Koppers Co). আবডারহালডেন (Abderhalden) মতানুযায়ী আলকাত্‌রার ডিস্টিলেশন করবার উদ্দেশ্যে বহির্দেশ এবং অন্তর্দেশ থেকে উত্তপ্ত করা যায়—এমন একটি অবিরত (Continuous), শায়িত স্টিলস্ চালু করেন। লণ্ডনের সাউথ

মেট্রোপলিটান গ্যাস কোম্পানী টিউব স্টিলের মাধ্যমে প্রায় গত ৫০ বছর ধরে আলকাত্‌রা ডিস্টিলেসন চালু রাখেন। ১৯৪২ সালে জার্মেনীর Teerverwertung Gesellschaft সিঙ্গল পাস সিঙ্গল ফ্ল্যাস টিউব ষ্টিলের প্রচলন করেন। সাধারণত রাস্তা তৈরির জন্যে যে আলকাত্‌রার ব্যবহার হয় এবং কার্বন ইলেক্ট্রোড তৈরির জন্যে যে পিচের প্রয়োজন হয়, তা প্রস্তুতের জন্যে এই যন্ত্রের ব্যবহার হয়। যে সব পিচ্‌ ১০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের চেয়ে বেশী উত্তাপে নরম হয়ে যায়, তা তৈরির জন্যে এই যন্ত্রের ব্যবহার হয় না। এরূপ পিচ্‌ তৈরির জন্যে আমেরিকার ব্যারেট কোম্পানী ডবল পাস, ডবল ফ্ল্যাশ টিউব ষ্টিলস্‌ চালু করেন। ১৯৪৮ সালে কপার্স (Coppers Co.) এই ধরনের ষ্টিলস্‌ চালু করেন। এই যন্ত্রের মাধ্যমে ১৮০-৩০০ ডিগ্রী ফারেনহাইটে যে সব পিচ্‌ নরম হয়ে যায়, সে ধরনের নানা প্রকার পিচ্‌ তৈরি করা যায়।

৪০০ ডিগ্রী ফারেনহাইটে নরম হয় এমন পিচ্‌ তৈরির জন্যে সিঙ্গল পাস, ডবল ফ্ল্যাশ ষ্টিলের সৃষ্টি হয়। উইলটন্স পেটেণ্ট ফার্নেস কোম্পানী লিমিটেড (Wiltons Patent Furnace Co. Ltd) রিসার্কুলেটিং টিউব ষ্টিলস্‌ চালু করেন। এই ধরনের ষ্টিলসে ১০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের কম উত্তাপে যে পিচ্‌ নরম হয়ে যায়, তা তৈরি করা হয়। কম্বাইন্‌ড্‌ (Combined) টিউব এবং স্যাঙ্ক ষ্টিলস্‌ ১৯৫০ সালে ইংল্যাণ্ডে চালু করা হয়।

আলকাত্‌রাকে ডিস্টিল করে চারটি অংশে ভাগ করা চলে। ২০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের কম উত্তাপে যে অংশটি ডিস্টিল্‌ড্‌ হয়ে বেরিয়ে আসে, তাকে লাইট অয়েল (Light oil) বলা হয়। এটা আলকাত্‌রার শতকরা ০·৫ থেকে ২ ভাগ মাত্র। এটা কোন গ্যাসকে ঠাণ্ডা করে যে লাইট অয়েল পাওয়া যায়, তাথেকে পৃথক্‌। আলকাত্‌রার লাইট অয়েলে বেঞ্জিন, টলুয়িন ও জাইলিন অতি অল্প মাত্রায় পাওয়া যায়। গ্যাসের লাইট অয়েলে এই রাসায়নিক পদার্থগুলি যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান থাকে, সে জন্যে সাধারণত কোল গ্যাস থেকে এদের উদ্ধার করা হয় এবং এই কারণেই অনেক সময় আলকাত্‌রার লাইট অয়েলকে পৃথকভাবে সংগ্রহ করা হয় না। আলকাত্‌রার লাইট অয়েল অংশ থেকে বেঞ্জিন, টলুয়িন ও জাইলিন আলাদা করে নিলে যা বাকী থেকে যায় তাকে সলভেণ্ট ন্যাপ্‌থা নাম দেওয়া হয়েছে। এই সলভেণ্ট ন্যাপ্‌থা থেকে কুমারোন ইণ্ডেন জাতীয় রজন তৈরি করা যায়। লিনোলিয়াম (Linolium),

ছাপাখানায় ব্যবহার্য কালি, বার্ণিশ প্রভৃতি তৈরির জন্যে এই সল্‌ভেন্ট ন্যাপ্‌থার (Solvent Naptha) ব্যবহার হয়।

২০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড থেকে ২৫০ ডিগ্রী পর্যন্ত উত্তাপ দিলে যে অংশটি বেরিয়ে আসে, তাকে মিডিল অয়েল বলা হয়। ২৩৫ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড অবধি উত্তাপ দিলে আলকাত্‌রা থেকে যে অংশটি বেরিয়ে আসে, তাকে আমেরিকায় আলকাত্‌রা অ্যাসিড অয়েল (Tar acid oil) বা রাসায়নিক তেল (Chemical oil) বলা হয়। ১৮০-২৫০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড উত্তাপে যা বেরিয়ে আসে, তাকে রিফাইনড্‌ টার অ্যাসিড অয়েল বলা হয়। এটি পোকামাকড় মারবার জন্যে ফ্লিটের (Flit) ন্যায় ব্যবহৃত হয়। এছাড়া ডিসনফেক্ট্যান্ট (Disinfectant) রূপে কয়লা বা অন্য খনিজ পদার্থগুলি ধৌত করবার জন্যে এবং হেভি ডিউটি (Heavy Duty) ময়লা পরিষ্কারক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। আলকাত্‌রার অ্যাসিড (Tar acid) অংশ থেকে ক্রিয়োজোট (Creosote) নামক একটি ভগ্নাংশ পাওয়া যায়।

এটা ২০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড উত্তাপে ফুটতে থাকে এবং ৩১৫ ডিগ্রী পর্যন্ত উত্তাপে ডিষ্টিল্‌ড্‌ হয়ে বেরিয়ে আসে। কাঠকে দীর্ঘস্থায়ী করবার জন্যে এটা ব্যাপকভাবে আমেরিকায় ব্যবহৃত হয়। আলকাত্‌রার শতকরা ২০ ভাগই ক্রিয়োজোট। আলকাত্‌রার অ্যাসিড অংশ বলতে সাধারণত ফেনোল জাতীয় পদার্থগুলিকেই বোঝায়। এই অংশ থেকে ফেনোল ও ক্রেজোল পাওয়া যায়। আলকাত্‌রার অ্যাসিড অংশ থেকে রাসায়নিক প্রথায় বহু প্রকারের রাসায়নিক পদার্থ তৈরি করা যায়। ঐগুলি নানা প্রকার ওষুধ, সুগন্ধী পদার্থ প্লাস্‌টিসাইজার (Plasticiser) এবং বিস্ফোরক তৈরির জন্যে বিশেষ প্রয়োজনীয় মূল রাসায়নিক পদার্থ।

কেমিক্যাল অয়েল অংশ থেকে আর একটি মূল্যবান পদার্থ পাওয়া যায়, সেটির নাম ন্যাপ্‌থালিন। ন্যাপ্‌থালিনের সঙ্গে সকলেই পরিচিত। পশমের তৈরি কাপড়, জামা, শাল প্রভৃতিকে মথ (Moth) নামক কীটের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্যে ন্যপ্‌থালিনের ব্যবহার হয়। এছাড়া ন্যাপ্‌থালিন থেকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে ক্যাটালিটিক অক্সিডেসন করে ন্যাপ্‌থালিনকে থ্যালিক অ্যানহাইড্রাইডে পরিণত করা যায়। রিফাইন্‌ড্‌ (Refined) ন্যাপ্‌থালিন নানা প্রকার রং তৈরির জন্যে মূল পদার্থ রূপে ব্যবহৃত হয়।

আলকাত্‌রার মিডিল অয়েল অংশ থেকে ন্যাপ্‌থালিনকে প্রথমেই পৃথক করে নেওয়া হয় এবং যা বাকী থাকে তাতেই আলকাত্‌রার অ্যাসিড অংশ বলা হয়।

২৫০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড থেকে ৩০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড উত্তাপে আলকাত্‌রার যে অংশটি বেরিয়ে আসে, তাকে হেভি অয়েল (Heavy oil) বলা হয়।

৩০০ ডিগ্রী থেকে ৩৫০ বা ৩৬০ ডিগ্রী উত্তাপে যা ডিষ্টিল্‌ড্‌ হয়ে বেরিয়ে আসে, তাকে অ্যানথ্‌াসিন অয়েল বলা হয়। অ্যানথ্‌াসিন অয়েল (Anthracene oil) থেকে ফেনানথে্ন ও কারবাজোল পৃথক করে নিলে অ্যানথ্‌াসিন পাওয়া যায়। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় অ্যানথ্‌াসিনকে অ্যানথ্‌া-কুইনোন রং তৈরির জন্যে এনথ্রাকুইনোনে পরিণত করা হতো। আজকাল থ্যালিক অ্যানহাইড্রাইট থেকে ঐ জাতীয় রং প্রস্তুত করা যায় বলেই অ্যানথ্রাসিনের চাহিদা কমে যাচ্ছে।

৩৬০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড উত্তাপের পর যা অবশিষ্ট থেকে যায়, তাকেই পিচ- (Pitch) বলা হয়। উপরে দেখা গেছে যে, আলকাত্‌রাতে কিছু অ্যাসিড অংশ আছে, কিন্তু এতে বেস (Base) অংশ নেই মনে করলে ভুল হবে। এতে কিছু বেসও (Base) থাকে। পিরিডিন (Pyridin), পিকোলিন (Picoline), লুটিডিন (Lutidine), কুইনোলিন প্রভৃতি পদার্থগুলিকে আমরা গ্যাসের লাইট অয়েল অংশে পাই। আলকাত্‌রার কেমিক্যাল অয়েল অংশে আমরা হাই-বয়েলিং বেসগুলির (Base) দেখা পাই। ২৩৫ ডিগ্রী অবধি উত্তাপে যা ডিষ্টিল্‌ড্‌ হয়ে বেরিয়ে আসে, তাথেকে আলকাত্‌রার অ্যাসিড অংশ পৃথক করবার পর এগুলিকে পাওয়া যায়। কেমিক্যাল অয়েলকে সালফিউরিক অ্যাসিড দিয়ে ধুয়ে তাতে কষ্টিক সোডা (Caustic soda) দিলে, আলকাত্‌রার বেস অংশগুলি অন্য অংশ থেকে পৃথক হয়ে আসে। এরপর ডিষ্টিল করলে বেসগুলিকে পাওয়া যায়। সম্প্রতি কুইনোলিন (Quinoline) নামক বেসটিকে এভাবে আলকাত্‌রা থেকে পাওয়া গেছে। কুইনোলিন, নিকোটিনিক অ্যাসিড এবং ৮ হাইড্রক্সি কুইনোলিন তৈরি করবার জন্যে ব্যবহার করা হয়। এই দুটি পদার্থ থেকে মূল্যবান ওষুধ তৈরি হয়। এ দেশে এতদিন পর্যন্ত টাটা কোম্পানীর জামসেদপুরের কারখানায় এবং ইণ্ডিয়ান আয়রন অ্যাণ্ড ষ্টিল কোম্পানীর কুলটি ও হীরাপুরের কারখানাতেই আলকাত্‌রা তৈরি

হতো। বম্বের গ্যাসকোম্পানীর কারখানায় ও কলকাতার ওরিয়েণ্টাল গ্যাস কোম্পানীর কারখানাতেও কিছু আলকাত্‌রা তৈরি হতো—একত্রে বছরে তৈরি হতো ৮৮০০০ টন। এখন ভিলাই, রুরকেল্লা ও দুর্গাপুরের কারখানেতেও যথেষ্ট আলকাত্‌রা তৈরি হবে।

আলকাত্‌রার ডিষ্টিলেশন করবার জন্যে ভারতে মাত্র তিনটি কারখানা ছিল ; যথা—শালিমার টার প্রোডাক্টস্‌ লিমিটেড (Shalimar Tar Products Ltd.), বারোরি কোক কোম্পানী (Barroea Coke Co) এবং বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড (Bengal Chemical & Pharmaceutical Works Ltd)।

ভারতে ২ প্রকার ষ্টিলের ব্যবহার হয় ; ১। পট বা ব্যাচ ষ্টিলস্‌ (Pot or Batch still), ২। ক্যাসকেড ষ্টিলস্‌ (Cascade still)। অবিরত (Continuous) ষ্টিলস্‌ শুধু শালিমার টার কোম্পানীতেই ব্যবহৃত হয়।

১৯৪২ সালে ভারতে প্রায় ৬০,০০০ টন আলকাত্‌রা ডিষ্টিল্‌ড্‌ করা হয়েছিল।

আলকাত্‌রা থেকে ন্যাপ্‌থালিন পাওয়া যায়, তা পূর্বেই বলা হয়েছে। ভারতীয় আলকাত্‌রায় শতকরা ৪ ভাগ ন্যাপথালিন পাওয়া যায়। শালিমার টার প্রোডাক্টস্‌ কোং ন্যাপ্‌থালিন থেকে থ্যালিক অ্যানহাইড্রাইট তৈরি করেছেন।

আলকাত্‌রার একটা অংশে ফেনোল পাওয়া যায়, তা আগেই বলা হয়েছে। ফেনোল ফরম্যালডিহাইডের রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে প্লাষ্টিক তৈরি হয়। ভারতে এই ধরণের প্লাষ্টিক তৈরি হচ্ছে।

আলকাত্‌রাকে কোন প্রকার রাসায়নিক প্রক্রিয়া না করেও ব্যবহার করা চলে—তা সকলেই জানেন। কিছুদিন পূর্বেও ছোট ছোট সহরে দরজা, জানালা, জানালার গরাদে, কড়ি-বরগা প্রভৃতির কাঠ ও লোহার জিনিষগুলিতে আলকাত্‌রার বার্নিশ লাগানো হতো। আলকাত্‌রার ব্যবহার প্রসঙ্গে আর একটি কথা জেনে রাখা উচিত। সেটি হচ্ছে সহরের রাস্তাগুলিকে আলকাত্‌রা দিয়ে ম্যাকাডামাইজ করা। রাস্তার জন্যে যে আলকাত্‌রার ব্যবহার হয়, তা নিম্নলিখিত উপায়ে তৈরি করা হয়।

হাই-টেম্পারেচার কার্বনাইজেসনের ফলে কয়লা থেকে যে আলকাত্‌রা

পাওয়া যায়, তাকে ডিস্টিল করে তার ফেনোল অংশ ও ন্যাপ্‌থালিন এমন ভাবে বের করে নিতে হয় যে, এক প্রকার নরম পিচ্‌ অবশিষ্ট থেকে যায়। এই রকম পিচের সঙ্গে হেভি ক্রিয়োজোট অংশটি মিশাতে হয়। নিম্নে প্রদত্ত স্পেসিফিকেশন থেকে পৃথক না হয়, এভাবে উপরিউক্ত মিশ্রণের কাজটি সম্পন্ন করতে হয়।

রাস্তা তৈরির উপযুক্ত আলকাত্‌রা সাধারণত যে তিন প্রকারের স্পেসিফিকেশনের হয়, তা নিম্নে দেওয়া হলো।

	১ নম্বর	২ নম্বর	৩ নম্বর
Viscosity	১০—৪০ সেকেণ্ড ৩০°তে	৪০—১২৫ সেঃ ৩০°তে	৭০—১২০ সেকেণ্ড ৩০°তে
অ্যামোনিয়া	০·৫% চেয়ে কম	০·৫% চেয়ে কম	শতকরা ০·৫-এর চেয়ে কম
লাইট অয়েল, যা ২০০° নীচে ডিস্টিল হয়	১% চেয়ে কম	১% চেয়ে কম	১% চেয়ে কম
যা ২০০°—২৭০°	৯—২১%	৮—১৬%	৬—১২%
ডিস্টিল হয়	৩·৫—১২%	৩·৫—১২%	৩·০—৮%
ফেনোল	৫%	৪%	২%
ন্যাপ্‌থালিন	৬%	৫%	৩%
কার্বন	২০%	৬—২১%	৮—২২%

উপসংহার

আমাদের কয়লার খনিতে যে কালোমানিক নিহিত আছে, তা যে অতীত যুগের উদ্ভিদের কবরাস্থি, তা পূর্বেই বলা হয়েছে। মানব আমাদের এই ধরিত্রী মাতার ক্রোড়ে জন্ম নেবার বহু যুগ পূর্বে ঐ জাতীয় উদ্ভিদেরা মানবের উপকারার্থে নিজেদের অস্থি ভূগর্ভে রেখে গেছে। কত শত শতাব্দী থেকে মানব এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছে, কিন্তু মাত্র ১০০০ বছর পূর্বে খনি খনন করে মানব এই কালোমানিক কয়লাকে আপনার কল্যাণে ব্যবহার করতে শিখেছে। এর পর প্রায় ৫০০ বছর মানবের হিতার্থে কয়লার ব্যবহার সীমাবদ্ধই ছিল। মাত্র ৩০০ বছর পূর্বে বৈজ্ঞানিক প্রথায় কয়লা থেকে মানবের প্রয়োজনীয় নানা প্রকার পদার্থ সৃষ্টি করবার চেষ্টা সুরু হয়। মাত্র ১৭০ বছর পূর্বে এই কালোমানিক যে সত্য সত্যই আলো দিতে পারে, তা মারডক (Murdock) প্রথম গ্যাসের কারখানা সৃষ্টি করে প্রমাণ করেন। তার পরের ১৭০ বছর মানব কিভাবে ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়ে এই উদ্ভিদ-দধিচীর অস্থিকে মানবের হিতার্থে ব্যবহার করেছে, তা আমরা দেখেছি।

যদিও কয়লতে বেঞ্জিন, টলুয়িন, ন্যাপ্থালিন, অ্যানিলিন বা অ্যালিজারিন বিদ্যমান নেই, তবুও মানব কি করে কয়লাকে হাই-টেম্পারেচারে কার্বনাই-জেসন করে এই সব পদার্থগুলিকে কৃত্রিম উপায়ে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে, তাও আমরা দেখেছি। আমাদের আজকের রঙের কারখানা, ওষুধের কারখানা, কৃত্রিম স্যাকারিনের কারখানা, বিস্ফোরকের কারখানা যে এই সব কৃত্রিম পদার্থগুলির ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত, তা ভুললে চলবে না। সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও মনে রাখতে হবে যে, হোফম্যানের ন্যায় মনীষীদের অক্লান্ত চেষ্টার ফলে কৃত্রিম উপায়ে অ্যালিজারিন, অ্যানিলিন ও ইণ্ডিগো তৈরি হয়েছিল, কিন্তু এই অমূল্য পদার্থগুলিকে যে সব পদার্থ থেকে গড়ে তোলা হয়, তারা কয়লা থেকেই উৎপন্ন।

কয়লা যেখানে গুঁড়া করা হয় সেখানকার ময়লা, কয়লা থেকে যেখানে গ্যাস বা কোক তৈরি হয় সেখানকার গরম, যেখানে আলকাত্‌রাকে ডিষ্টিল করা হয়, সেখানকার দুর্গন্ধ আমাদের কাছে অসহ্য হলেও যখন আমরা অ্যানিলিন বা ট্রাই ফিনাইল মিথেন জাতীয় রঙের বর্ণচ্ছটা দেখি, কিম্বা যখন

কৃত্রিম পারফিউমের সুগন্ধে মাতোয়ারা হই অথবা শিরঃপীড়ায় ছট্‌ফট করতে করতে অ্যাসপিরিন খাই, তখন এই কালোমানিক কয়লার কীর্তি দেখে অবাক হয়ে যাই। আনন্দ উৎসব উপলক্ষে যখন আমরা বাজি পোড়াই বা যুদ্ধের দিনে যখন আমরা শত্রুর শিবিরে বিস্ফোরক ফেলি, তখনও আমাদের কয়লার শরণ নিতে হয়।

রাসায়নিক ও রাসায়নিক ইঞ্জিনীয়ারদের অক্লান্ত চেষ্টার ফলে কয়লা থেকে মেটালার্জিক্যাল কোক তৈরি না হলে আমাদের লৌহ ও স্টিলের কারখানার এত প্রসার লাভ সম্ভব হতো কি? আলকাত্‌রার ডিস্টিলেশন যে এ যুগের অর্গ্যানিক রাসায়নিক উদ্যোগের ভিত্তি তা ভুললে আমরা যে কত বড় ভুল করবো, তা বলা যায় না। মোটর গাড়ী চালাবার জন্যে আজ যে বেঞ্জোলের ব্যবহার হয়, তা কে না জানেন! কিন্তু তা যে কয়লা থেকে উপজাত, তা হয়তো অনেকেই জানেন না।

অ্যালিফ্যাটিক (Aliphatic) রসায়নের ক্ষেত্রে কয়লার দান কম নয়! কয়লার গ্যাসের মিথেন থেকে সোজাসুজি যে ফরম্যালডিহাইড তৈরি করা সম্ভব, তা আজ আর অবিশ্বাস করা চলে না। ফরম্যালডিহাইডের সাহায্যে গরম কালে যে মুর্গী বা হাঁসের ডিমকে পচন থেকে রক্ষা করা চলে, তা হয়তো অনেকেই জানেন। ফরম্যালডিহাইড থেকে যে কত প্রকার ওষুধ তৈরি হয়েছে, তা রাসায়নিকদের নিকট অবিদিত নেই। জার্মান বৈজ্ঞানিক ভিলস্টেটার (Willstater) ইথিলিন ও অক্সিজেন থেকে যে ফরম্যালডিহাইড তৈরি করা যায়, তা দেখিয়েছেন।

আদি আলকাত্‌রার ফেনোল অংশে যে ক্রেজোল ও জাইলেনিল পাওয়া যায়, তাথেকে ফ্রাঞ্জ ফিশার (Franz Fisher) ও তাঁর শিষ্যেরা কত সহজে বেঞ্জিন তৈরি করেছেন, তা রাসায়নিকেরা জানেন। শ্রোটার (Schroter), স্রাউথ (Schrauth) এবং ফন গুইনার (Von Gwinner) ন্যাপ্‌থালিনকে টেট্রালিন ও ডেকালিনে পরিণত করে পেণ্ট তৈরি কত সহজ করে দিয়েছেন, তা পেণ্ট ব্যবসায়ীরা বেশ ভাল ভাবেই জানেন। আর ন্যাপ্‌থালিন যে কয়লার দান, তা আমরা দেখেছি। বার্জিয়াস (Bergius) কয়লাকে হাইড্রোজেনেট করে যে গ্যাসোলিন উৎপন্ন করেছিলেন, তা আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি।

ফ্রাঞ্জ ফিশার ও তাঁর শিষ্যেরা কয়লা থেকে বিউটি্ক অ্যাসিড ও অন্যান্য চর্বি অ্যাসিড (Fatty acid) তৈরি করে যুদ্ধের সময় জার্মেনীর সাবান তৈরির সমস্যার সমাধান করেন—একথা হয়তো অনেকেই জানেন। কয়লা ও চুনের রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে যে অ্যাসিটিলিন তৈরি হয়, তা আজ আমরা সকলেই জানি ; কারণ এখন এদেশে ক্যালসিয়াম কারবাইড প্রস্তুত হচ্ছে। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় জার্মেনীর লেভারকুসেন (Leverkusen) সহরে ওদেশের বৈজ্ঞানিকেরা কয়লা থেকে এক প্রকার রবার তৈরি করে যুদ্ধ চালাতে সক্ষম হন। কয়লা ও চূনের রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে যে ক্যালসিয়াম কারবাইড তৈরি করা হয়, তা পূর্বেই বলেছি। এই কারবাইড থেকে যে অ্যাসিটিলিন তৈরি হয়, তা সকলেই জানেন। অ্যাসিটিলিনকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে অ্যাসিট্যালডিহাইডে (Acetaldehyde) পরিণত করে তাথেকে অ্যাসিড (Acetic acid) তৈরি করা হয়েছিল। ঐ অ্যাসিটিক অ্যাসিড থেকে অ্যাসিটোন তৈরি করে তাকে রবার তৈরির উপযোগী কাঁচা মাল (Raw material) হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছিল। এই ভাবে লেভার-কুসেনে বছরে ২০০০ টন মেথিল রবার তৈরি হতো। ভবিষ্যতে এই কালোমানিক কয়লা থেকে যে আরও কত জিনিষ মানবের কল্যাণের জন্যে তৈরি হবে, তা কে বলবে ? ফ্রাঞ্জ ফিশারের (Eranz Fisher) সিনথেসিস গ্যাস (Synthesis gas) তার কিছু কিছু ইঙ্গিত দেয়।

লোকবিজ্ঞান গ্রন্থমালা (৪)

কয়লা / রামচন্দ্র ভট্টাচার্য

দাম : দুই টাকা।

